রোগ ও তাহার প্রতিকার

অমিয় কুমার মজুমদার

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

রোগ ও তাহার প্রতিকার

অমিয়কুমার মজুমদার

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট
কলিকাতা-6

Approved for ISES

[illegible]

22/10/91

রোগ ও তাহার প্রতিকার

অমিয়কুমার মজুমদার

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট
কলিকাতা-6

প্রকাশক :-
অপরাজিত বসু
কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
কলিকাতা-6

মুদ্রক :-
নব দত্ত
শৈলী প্রেস
4এ মানিকতলা মেইন রোড
কলিকাতা-54

প্রথম সংস্করণ :-
এপ্রিল, 1966
দ্বিতীয় সংস্করণ :-
মার্চ, 1991

মূল্য : পনেরো টাকা

ভূমিকা

দীর্ঘকাল পর অমিয়কুমার মজুমদারের "রোগ ও তাহার প্রতিকার" পুস্তিকাটির নতুন মুদ্রণ প্রকাশিত হলো। মানুষের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কৌতূহলের সূত্র ধরে একসময় লোকবিজ্ঞান গ্রন্থমালা সিরিজে এই বইটি প্রকাশ করা হয়েছিল এবং পাঠকের দরবারে যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছিল। ইতিমধ্যে, স্বাস্থ্য ও রোগ-ভোগের বিষয়ে আমাদের ভাবনা বা দুর্ভাবনা কমেনি বরং সমাজের ও ব্যক্তিজীবনের জটীলতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার বৃদ্ধি ঘটেছে। অসুস্থতার লক্ষণগুলি জানলে মানুষ প্রাথমিকভাবে কিছু প্রতিরোধের ব্যবস্থা করতে পারে। মূল সংস্করণে চিকিৎসা সম্পর্কে যে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল তা হয়তো আজ বহুলাংশে পরিত্যক্ত, তবু রোগের লক্ষণ-বিচার ও প্রতিরোধের প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি এখনও মূল্যবান। আশা করি, পুস্তিকাটি এখনকার পাঠক আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করবেন।

বইটি পুনর্মুদ্রণকল্পে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর যে আংশিক অর্থ সাহায্য করেছেন তার জন্য বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে।

অপরাজিত বসু
কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

১২ মার্চ ১৯৯১
কলকাতা

নিরন্তর আধি-ব্যাধিতে প্রপীড়িত পৃথিবীর রোগক্লিষ্ট জনগণের একজনও যদি এই পুস্তক পাঠে উপকৃত হয়, তার রোগ-যন্ত্রণার কিঞ্চিৎ উপশম হয়ে মুখে হাসি ফোটে তাহলে আমি আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান করবো। ইতি—

গ্রন্থকার

এপ্রিল, ১৯৬৬

সূচী

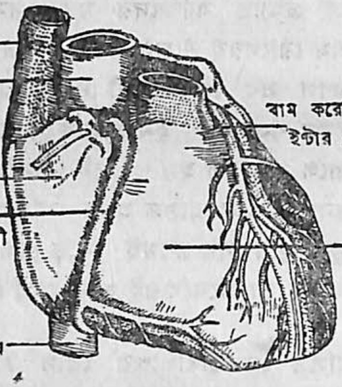
করোনারি থ্রম্বোসিস

খবরের কাগজে প্রখ্যাত ব্যক্তিদের মৃত্যু সমাচারে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কয়েকটি বিশেষ রোগেরই উল্লেখ থাকে। এর মধ্যেও আবার একটি রোগেরই প্রকোপ সব চেয়ে বেশী দেখা যায়। 'মাথাওয়ালা' মানুষদের অর্থাৎ যাঁদের বলা হয় 'ইনটেল্যেকচুয়াল' তাঁদের বেশীর ভাগই এই বিশেষ রোগে কবলিত হন। এই রোগটি হলো 'করোনারি থ্রম্বোসিস'। নাম শুনলেই যেন আতঙ্ক হয়। কয়েক বছর ধরে দেখা যাচ্ছে, এই রোগে মৃত্যুর হার যেন ক্রমেই বেড়ে চলেছে। নাম জানা থাকলেও ব্যাপারটি যে কি তা অনেকেরই জানা নেই।

করোনারি থ্রম্বোসিস যে হৃৎপিণ্ডের রোগ তা সবাই জানে। করোনারি শব্দটি এসেছে হৃৎপিণ্ডের 'করোনারি ধমনী' থেকে। বাকী শব্দ থ্রম্বোসিস কথার মানে রক্ত জমাট বাঁধা। অতএব আমরা বুঝতে পারছি যে, করোনারি থ্রম্বোসিস কথার অর্থ করোনারি ধমনীর মধ্যে রক্তের জমাট বাঁধা।

মূল প্রসঙ্গে যাবার আগে হৃৎপিণ্ড সম্বন্ধে সামান্য জ্ঞান আহরণ করা প্রয়োজন। এই যে যন্ত্রটি অনবরত বুকের নীচে ধুক্ ধুক্ করে চলেছে সেটি কি? এই যন্ত্র, বা হার্ট কিন্তু মাংস-পেশীর দ্বারা তৈরী একটি বিশেষ ধরণের পাম্প ছাড়া আর কিছুই নয়। একটা লম্বা পার্টিশন দিয়ে দু'ভাগে বিভক্ত রয়েছে আমাদের হার্ট, বা হৃৎপিণ্ড—একটি বাম, আর একটা ডান। এ দু'টি ভাগের প্রত্যেকটি আবার আর একটি আড়াআড়ি পার্টিশন দিয়ে দু-ভাগে বিভক্ত। এর ফলে

যা দাঁড়ালো—তা হলো এই, বাঁ-দিকে দু'টি কুঠুরি, ডান দিকেও তেমনি ; অর্থাৎ কুঠুরির দু'টি উপরে ও দু'টি নীচে। উপরের দু'টির নাম অলিন্দ (Auricle বা Atrium) এবং নীচের দু'টির নাম নিলয় (ventricle)। (1নং চিত্র)



1নং চিত্র

হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীও স্বতন্ত্র ধরনের। তার নাম মায়োকার্ডিয়াম। মাংসপেশীর প্রত্যেকটি সুত্র পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত অবস্থায় আছে। ফলে কখনো কোন উত্তেজনা সৃষ্টি হলে সমগ্র মাংসপেশীতে একই সঙ্গে ঐ উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এই বিশেষত্বটি হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীর। এটি এমনই এক যন্ত্র যে, কোন বহিরাগত উত্তেজনা ব্যতিরেকেই কাজ করে যেতে পারে। নিজেই নিজের কাজ করবার প্রয়োজনীয় প্রেরণা (চিকিৎসকের ভাষায় উত্তেজনা) যোগায়। হৃৎপিণ্ড একবার সংকুচিত হয়, পরের মুহূর্তেই প্রসারিত হয়। এই সংকোচন ও প্রসারণ প্রক্রিয়াকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলা হয়, সিস্টোল

(Systole) এবং ডায়াস্টোল (Diastole)। হৃৎপিণ্ডের বাঁ দিকের নিলয়ে থাকে অক্সিজেন সমন্বিত বিশুদ্ধ রক্ত। এটি হলো হার্টের বিশুদ্ধ রক্তের আধার। ডান দিকের নিলয়ে স্বাভাবিক ভাবেই থাকে অবিশুদ্ধ অর্থাৎ অক্সিজেন-বিহীন রক্ত।

দেহের সর্বস্থান থেকে অক্সিজেন-বিহীন রক্ত বিভিন্ন শিরা ও পরিশেষে ঊর্ধ্ব ও নিম্ন মহাশিরা দিয়ে বাহিত হয়ে উপনীত হয় হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ নিলয়ে। ঊর্ধ্ব মহাশিরা দিয়ে অবিশুদ্ধ রক্ত হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ অলিন্দে এসে পড়ে। সেখান থেকে তা আসে দক্ষিণ নিলয়ে।

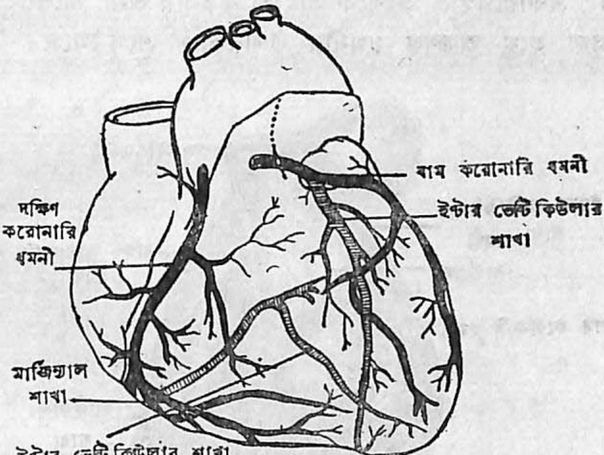
এখান থেকে রক্ত ফুসফুসে যায় পরিশোধিত হবার জন্যে। রক্ত পরিশোধিত হবার পর তা প্রথমে আসে বাঁ দিকের অলিন্দে, পরে আসে বাম নিলয়ে। এই নিলয় থেকে উদ্ভূত হয়েছে মহাধমনী বা Aorta। বাঁ-নিলয়ে রক্ত ভর্তি হলে তা নিজ থেকেই সংকুচিত হতে আরম্ভ করে। এর ফলে বিশুদ্ধ রক্ত মহাধমনী বাহিত হয়ে সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। এই প্রসঙ্গে মহাধমনীর কথা সামান্য বলা প্রয়োজন। এর উৎপত্তির জায়গাতে তিনটি স্থানে তিনটি স্ফীতকায় অংশ আছে। এদের নাম সাইনাস। এই সাইনাস থেকে উৎপত্তি হয়েছে হৃৎপিণ্ডকে রক্ত সরবরাহকারী ধমনীর।

রক্ত ছাড়া হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশী বাঁচতে পারে না। বলা বাহুল্য, মানবদেহে এমন কোন যন্ত্র আছে কিনা সন্দেহ, যা রক্ত বিনা বেঁচে থাকতে পারে। রক্তের সঙ্গে থাকে অক্সিজেন আর প্রয়োজনীয় খাদ্য। দু'টি সাইনাস থেকে দু'টি করোনারি ধমনীর উৎপত্তি হয়েছে। সেগুলি যথাক্রমে বাম ও দক্ষিণ করোনারি ধমনী। বাঁ-দিকের করোনারি ধমনী বাম দিকের অংশ ও বাম-নিলয়কে, এবং ডান করোনারি

ধমনী হৃৎপিণ্ডের পেছনের, ডান দিকের ও সামান্য পরিমাণে বাঁ-দিকের অংশ সমূহকেও বিশুদ্ধ রক্ত সরবরাহ করে। গাছের শাখা-প্রশাখার মত করোনারি ধমনী থেকেও বহু শাখা-প্রশাখা বেরিয়ে হৃৎপিণ্ডের সর্বাংশে বিশুদ্ধ রক্ত সরবরাহ করে। করোনারি ধমনীর প্রশাখা ও আরো অনেক ছোট ছোট ধমনী (মূল করোনারি ধমনীর অংশরূপে) হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীর মধ্যে ঢুকে তার মধ্যে লেপ্টে থাকে। এই ক্ষুদ্র বা অতি ক্ষুদ্র ধমনীসমূহকে বলা হয় জালক বা ক্যাপিলারি। ক্যাপিলারিগুলি খুব সরু আর তাদের দেয়াল বেশ পাত্‌লা। তা হলে কি হবে, এরাই অক্সিজেন ও প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহ করে বাঁচিয়ে রাখে হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীকে। আবার এরাই ঐ মাংসপেশী থেকে নিষ্কাশিত আবর্জনা বয়ে নিয়ে আসে। জালকগুলি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিরার সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। কতিপয় শিরা একত্র হয়ে একটি বৃহৎ শিরা এবং কয়েকটি বড় শিরা একত্রে মিলে সৃষ্টি করে প্রধান শিরাকে। এই শিরা হৃৎপিণ্ডের অবিশুদ্ধ রক্ত বহন করে। শিরা-বাহিত রক্তে অক্সিজেন থাকে না (ফুসফুসের ক্ষেত্র বাদে), আর তার মধ্যে লেশমাত্র খাদ্যদ্রব্যও থাকে না। থাকে শুধু অপ্রয়োজনীয় আবর্জনা। শিরার মধ্যে দিয়ে এই সব আবর্জনা চলে আসে হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ অলিন্দে।

আমাদের শরীরে এমন অনেক আর্টারি বা ধমনী আছে, যেগুলি থাকে জোড়ায় জোড়ায়। অর্থাৎ তার একটা থাকে ডান দিকে আর একটা বাঁ-দিকে। এরা দু'দিকে প্রয়োজনীয় স্থানে রক্ত সরবরাহ করবার পর এমন এক জায়গাতে এসে হাজির হয়, যেখানে তারা দু'য়ে মিলে যায়। এই দু-মুখো ধমনীর একটা সুবিধে আছে। তা হলো এই, একদিকের ধমনী কোন রোগে কর্মহীন হয়ে পড়লে অপর দিকের ধমনী থেকে রক্ত এসে, অসুস্থ ধমনী যেখানে রক্ত সরবরাহ করতো, সেখানে রক্ত দিয়ে স্থানটি বাঁচিয়ে রাখতে পারে। হৃৎপিণ্ডের ক্ষেত্রে

এ ধরনের সুবিধে তেমন নেই বললেই চলে। মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করে এ বিষয়ে সঠিক খবর পাওয়া গেছে। পরীক্ষা করে জানা গেছে যে, শিশুকাল থেকে আরম্ভ করে ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত লোকের হৃৎপিণ্ডের রক্তসংবহনকারী ধমনীর প্রধান শাখাসমূহ বিস্তার পথে কখনোই এক সঙ্গে মেলে না। তবে মধ্যবয়স্ক লোকের করোনারি ধমনীর দু'টি শাখা কোন কোন সময়ে যে সংযোজিত হয় তা দেখা গেছে।

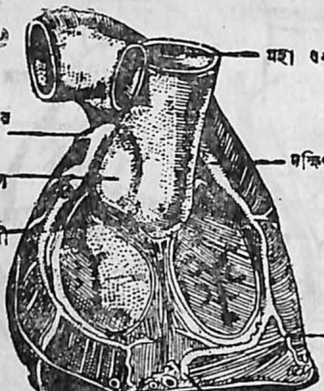


2নং চিত্র

ডান করোনারি ধমনীর দু'টি প্রধান শাখা আছে। তারা হলো—(1) মার্জিন্যাল (2) ইণ্টারভেণ্ট্রিকিউলার। অবস্থিতি অনুযায়ী এদের নামকরণ হয়েছে। হৃৎপিণ্ডের ডানদিকের ধার বা কিনারা দিয়ে যাবার জন্য নাম হয়েছে মার্জিন্যাল। আর নিলয় বা ভেণ্ট্রিক্‌ল-এর

মধ্যেকার মাংসপেশীকে রক্ত সরবরাহ করবার জন্যে নাম হয়েছে ইন্টার ভেন্ট্রিকিউলার। (2নং চিত্র)

বাঁ-দিকের করোনারি ধমনীর মাত্র একটি প্রধান শাখা আছে। এটি বেশ চওড়া। এর নাম ইন্টারভেন্ট্রিকিউলার। দু'দিকের দু'টি ইন্টারভেন্ট্রিকিউলার ধমনী হার্টের এপেক্স বা শীর্ষদেশের কাছে এসে মিলিত হয়। এর জন্য দায়ী প্রকৃতিদেবী। করোনারি আর্টারির কোন শাখা সামান্য মাত্র আক্রান্ত হলেই রক্ত থেকে বঞ্চিত হয় স্থানীয় এলাকা। একারণেই ঐ অংশকে সাহায্য করবার জন্য পাশের কোন ধমনী লম্বা হয়ে আক্রান্ত ধমনীর উপরিভাগে এসে মেলে। ফলে



3নং চিত্র

রক্তচলাচল স্বাভাবিক পর্যায়ে আসে। এই বিশেষ পদ্ধতির নাম কোল্যাটার‍্যাল সার্কুলেশন। (3নং চিত্র) বিপদের মুহূর্তে হৃৎপিণ্ড বেছে নেয় এই 'ব্যাক্-ডোর পলিসি'। এই হচ্ছে এক মাত্র পথ

সঙ্কটকালে বেঁচে থাকার। সকলেই মৃত্যুর আগে বেঁচে থাকার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। সে যে কোন ভাবেই হোক না কেন। হার্ট চায় চলতে, সে বিরামের বিরোধী। তাই খুঁজে নেয় বাঁচবার পথ।

করোনারি ধমনী হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীর প্রতিটি স্থানে নিয়মিত ভাবে রক্ত সরবরাহ করে চলে। কখনো বা বৃহৎ আকারের ধমনী দিয়ে, আবার কোন সময় ছোট ধমনীর সাহায্যে। যে কোন জায়গাতে (ধমনীর মধ্যে) রক্ত জমাট বাঁধলে রক্ত চলাচলে বাধা আসে। তার জন্যে যে সব স্থানে করোনারি ধমনীর মধ্যে রক্ত তঞ্চিত হয়, সে সব জায়গা মুহূর্তের মধ্যে হয়ে পড়ে একেবারে দেউলে। এক মিনিটেই নিঃস্ব, রক্ত-বর্জিত। আর তার ফলেই মানুষের জীবনে ঘনিয়ে আসে সঙ্কট।

করোনারি থ্রম্বোসিস এত আতঙ্কের কেন—যেহেতু এর আক্রমণ অকস্মাৎ হয়ে থাকে। আক্রান্ত ব্যক্তিকে আগে তেমন ভাবে বুঝতেও দেয় না যে, সে তার থাবা বসিয়ে দিচ্ছে। আর দেখা গেছে, মরণ কামড় দেবার সময় সেই গভীর নিশীথে। কতিপয় বিশেষজ্ঞ বলেন যে, করোনারি থ্রম্বোসিস সাধারণতঃ ডিসেম্বর মাসে বেশী হয়। আবার অনেকে মনে করেন হঠাৎ আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটলে এ রোগ হতে পারে। গরম ঘর থেকে হঠাৎ ঠাণ্ডায় বেরিয়ে এসে অনেকে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন, এমন দৃষ্টান্তও আছে।

এখানে অনেকের মনে প্রশ্ন উঠতে পারে, কেন এই রোগ আসে। শারীরবিজ্ঞান অনুসারে তার ব্যাখ্যা হলো এই ধমনী-প্রাচীরের একটি স্তর (Arterial intima) শুকিয়ে গেলে সংকুচিত হয়ে পড়ে রক্তচলাচলের পথ। যাকে বলা হয় অ্যাথেরোমা। এতে বাধা সৃষ্টি হয় রক্ত চলাচলে। কেন এমন হয় ? বয়স বাড়লে রক্তবাহী ধমনী সমূহও জরার আক্রমণ থেকে রেহাই পায় না। তারাও শুকিয়ে যেতে

থাকে। লুপ্ত হতে থাকে তাদের সঞ্জীবনী শক্তির ধারা। তাই দেখা যায়, মানুষ যখন তার জীবনের মাঝ-দরিয়াতে এসে পড়ে তখনই সে এ রোগের শিকার হয়। তার জন্যে একথা বলছি না যে, প্রতিটি লোকই এই রোগে আক্রান্ত হয়।

ধমনীগুলি যখন শুকিয়ে যায় (ডিজেনারেটেড) তখন বেড়ে যায় রক্তের চাপ। অর্থাৎ হাই ব্লাড প্রেসারের রোগীদের ধমনী স্বভাবতঃই শীর্ণকায়। কাজেই রক্তের চাপ খুব বেশী হলে করোনারি ধমনীর কোন শাখা রক্তের চাপে ছিঁড়ে যেতে পারে। এই ছিন্ন অংশ ক্রমে ক্রমে শুকিয়ে যায় এবং রক্ত চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে। এ তো গেল একটা কারণ। অনভ্যস্ত লোক যদি হঠাৎ ক্রমাগতভাবে অস্বাভাবিক পরিশ্রম করতে সুরু করে তাহলে তার হৃৎপিণ্ড তাড়াতাড়ি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং করোনারি ধমনীগুলি ধীরে ধীরে অকর্মণ্য হয়ে নিস্তেজ হয়ে যায়। তখন হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশী উপযুক্ত রক্ত পায় না ; ফলে নানা রোগে আক্রান্ত হয়।

অত্যধিক মানসিক চাপ এবং নানাবিধ উত্তেজনার মধ্যে যাদের দিন কাটে তাদের করোনারি ধমনী অল্প কালের মধ্যেই দুর্বল হয়ে পড়ে। তাছাড়া সিফিলিস, বাতরোগ বা অন্যান্য মারাত্মক সংক্রামক রোগের আক্রমণ হলে এই ধমনী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কোন কোন সময় আবার করোনারি ধমনীর মধ্যকার আয়তন (Lumen) ছোট হতে হতে একেবারে বন্ধ হয়ে পড়তে পারে। হঠাৎ কোন বড় শাখা-ধমনীর মধ্যেকার পথ যদি এমনি ভাবে বন্ধ হয়ে যায় তাহলে রক্তচলাচলে চরম বিঘ্ন উপস্থিত হয়। রক্তশূন্য মাংসপেশী ক্রমে অসাড় হয়ে একেবারে মরে যায়।

বেশী মানসিক উত্তেজনার ফলে, দীর্ঘকাল মস্তিষ্কের কাজ করলে, অথবা হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগলে কিংবা অজীর্ণতায় বা অতি আহারেও

করোনারি ধমনী রোগাক্রান্ত হয়ে পড়তে পারে। অতি আহারে পাকস্থলী এবং বৃহদন্ত্রের 'কোলন' (Colon) অংশ লম্বায় বেড়ে যায়। তখন উত্তেজনাপূর্ণ কাজ করলে কোন সময় করোনারি ধমনীর কোন শাখা ছিঁড়ে যেতে পারে। ফলে রক্ত চলাচলে বাধা পায়। বাধার পরিমাণ বেড়ে গেলে রক্ত চলাচল সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়।

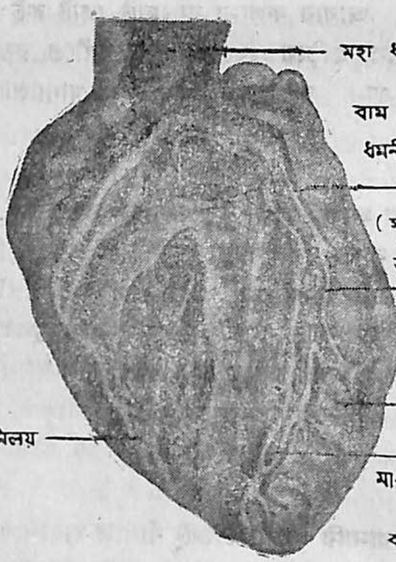
করোনারি ধমনীর মধ্যে কখনো বা একটা জমাট পিণ্ড থাকে। তাকে বলে ক্লট্। আবার কখনো বা ছোট ছোট ক্লট্ বিভিন্ন শাখার মধ্যে ইতস্তত ভাবে ছড়িয়ে থেকে মাংসপেশীতে রক্তসঞ্চালনে বাধা দেয়। বাধাপ্রাপ্ত স্থান অক্সিজেন বিহনে বা খাদ্যাভাবে বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

নানা পরীক্ষার ফলে একথা বুঝতে পারা গেছে যে শতকরা 66-75 ভাগ ক্ষেত্রে বাম করোনারি ধমনীর একটি বিশেষ শাখায় (Anterior descending branch of left coronary artery, বা বাম করোনারি ধমনীর নিম্নমুখী সম্মুখস্থ শাখা) এবং শতকরা 25 থেকে 47 ভাগ ক্ষেত্রে ডান করোনারি ধমনীতে থ্রম্বোসিস হয়। শতকরা 5—33 ভাগ ক্ষেত্রে বাম সারকমফ্লেক্স ধমনীতে এই রোগ হতে পারে।

বাঁ-দিকের করোনারি ধমনীতে ক্লট্ বাঁধলে হৃৎপিণ্ডের শীর্ষদেশের কাছে বাম নিলয়ের দেয়ালের সম্মুখভাগ এবং দু'টি নিলয়ের অন্তবর্তী দেয়াল (Inter ventricular septum) আক্রান্ত হয়।

রক্তবিহীন অবস্থায় মাংসপেশী যে তন্তু (Tissue) দিয়ে গঠিত তা ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে আরম্ভ করে। রোগাক্রমণের অন্ততঃ চব্বিশ ঘণ্টা পরে পেশীতন্তু পরীক্ষা করলে স্পষ্টভাবে তার নিদর্শন পাওয়া যায়।

করোনারি ধমনীর মধ্যে ছোট ক্লট্ থাকলে রক্ত চলাচলে খুব বেশী অসুবিধা হয় না একথা সত্য, কিন্তু ক্রমান্বয়ে ঐ জমাট পিণ্ড বড় হতে থাকে এবং শেষে রক্তচলাচলের পথ চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যায়। একারণেই দেখা গেছে যে, রোগের প্রথম আক্রমণের কয়েকদিন পরে গুরুতর ভাবে দ্বিতীয় আক্রমণ হয়। অধিকাংশ স্থলে রোগের আক্রমণ হঠাৎ আসে এবং এক বা দুই দিনের মধ্যেই সঙ্কটজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়। (4নং চিত্র)



4নং চিত্র

অনেক সময় দেখেছি, রোগী বা তার আত্মীয়-স্বজনেরা মনে করে, যে ক্লট রক্তচলাচলে বাধা দিচ্ছে তা বাইরে বেরিয়ে এসে অন্য কোথাও উপস্থিত হবে ও নতুন উপসর্গের সৃষ্টি হবে। বলা বাহুল্য, এ জাতীয় ধারণার কোন ভিত্তি নেই।

প্রথমে যদিও বলা হয়েছে, এ রোগ হঠাৎ আসে, কোন এত্তালা না দিয়ে, কিন্তু তা ঠিক নয়। কারণ, রোগের প্রথম আক্রমণের অন্ততঃ সপ্তাহখানেক আগে থেকে রোগী তার হার্টে চিন্‌চিনে ব্যথা অনুভব করে। তবে এই ব্যথার স্থায়িত্বকাল খুব কম বলে রোগী তা আমলে আনে না। একারণেই রোগ যখন সত্যিই আসে তখন তাকে আকস্মিক মনে হয়। আর তার ফলে রোগী ও তার বাড়ীর সকলে ঘাবড়ে যায়। ঘুমের মধ্যে যদি রোগ তার থাবা বসিয়ে দেয় তাহলে রোগী ব্যথার তাড়নায় চেঁচিয়ে ওঠে ঘুম থেকে। রোগী যন্ত্রণায় ছট্‌ফট করতে থাকে। যাদের অজীর্ণ রোগ থাকে তারা আরো অস্বস্তি অনুভব করে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এমনও হয়েছে যে, যন্ত্রণা একেবারে নেই তবু শ্বাসকষ্ট সুরু হয় প্রথম থেকেই। প্রথমে বুকের উপরে ব্যথা থাকে, তারপরে হাত ও অন্যান্য সব জায়গাতে ব্যথা ছড়িয়ে পড়ে। যন্ত্রণা আরম্ভ হলে রোগী বুকের মধ্যে চাপ অনুভব করে। এ যন্ত্রণা পরপর কয়েকদিন ধরে চলতে থাকে। এ ছাড়া শ্বাসকষ্ট, বমি, অস্থিরতা এবং অত্যধিক ঘাম হওয়া, এসব উপসর্গ তো থাকেই। রোগী ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং অজ্ঞান হওয়াও স্বাভাবিক ঘটনা।

কোন কোন ক্ষেত্রে আবার যন্ত্রণার বিন্দুমাত্র অনুভূতি পরিলক্ষিত হয় না, যেহেতু চেতনাশূন্য হয়ে পড়লে সব অশান্তির শেষ। রোগের প্রথম দিকে রোগীর হাত-পা ঠাণ্ডা হতে থাকে, আঙ্গুলের ডগা নীলাভ হতে থাকে। নাড়ী বেশ দ্রুত বেগে চলে। বারো ঘণ্টা বাদেই রক্তের চাপ নামতে থাকে। রোগের চতুর্থ দিনে রক্তের চাপ কমে গিয়ে দাঁড়ায় 80-90 mm Hg (সিস্টোলিক) এবং 30-35 mm Hg (ডায়াস্টোলিক)। এই সব লক্ষণগুলিকে বলা হয় শক্। এসময় বহু লোক মারা যায়। এ ছাড়া আবার অনেক সময় জ্বরও হতে

পারে। রোগীর সঙ্কটপূর্ণ অবস্থা 42 দিন পর্যন্ত থাকে। তবে যা হবার প্রথম দিকেই হয়।

থ্রম্বোসিস রোগে করোনারি ধমনীর মধ্যে জমাট পিণ্ডটি রোগের পঞ্চম-ষষ্ঠ দিন থেকে তাড়াতাড়ি বড় হতে থাকে। তাই পঞ্চমদিন থেকে তৃতীয় সপ্তাহের শেষ পর্যন্ত সময় রোগীর পক্ষে অতি সঙ্কটময় কাল। এ সময়েতেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে মৃত্যু হয়ে থাকে। অনেকের ক্ষেত্রে প্রথমেই দুটি নিলয়ের মধ্যেকার দেয়ালে ফুটো হয়ে যায়, তাতে রোগ আরো তাড়াতাড়ি শেষ পরিণতির দিকে যায়।

থ্রম্বোসিস রোগ নিঃসন্দেহে মারাত্মক, কিন্তু তাই বলে কি তার কোন চিকিৎসা নেই? নিশ্চয় আছে। প্রথমেই বলা হবে বিশ্রাম চাই অন্ততঃ মাস তিনেকের জন্য। নিরবিচ্ছিন্ন শান্তি।

রোগী থাকবে শুশ্রূষাকারীর উপরে একান্ত নির্ভরশীল। খুব সামান্য তরল খাদ্য দিতে হবে রোগীকে। প্রথম দু-তিন দিনের মধ্যে রোগীকে একদম নড়তে দেওয়া হবে না। মলত্যাগের সময় সতর্ক থাকতে হবে, যে-হেতু এ সময় বহু রোগী মারা যায়। শ্বাসকষ্ট নিবারণের জন্য অক্সিজেন গ্যাস দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। যেখানে তা নেই, সেখানে রোগীকে, বেশ আলো হাওয়া আসে, এমনি ঘরে রাখতে হবে। পাখার হাওয়া করতে হবে।

রোগ যখন ভালর দিকে, তা প্রায় মাস দুয়েক বাদে, বেশী বালিস দিয়ে উঁচু করে শোয়াতে হবে রোগীকে। ধীরে ধীরে হাঁটা বা সামান্য পেটের ব্যায়াম অভ্যাস করাতে হবে। দীর্ঘ দিন বিছনায় শুয়ে থাকার জন্য কারো কারো পায়ের বড় বড় শিরায় রক্ত জমাট বাঁধতে পারে। তাই শোয়া অবস্থাতেই পায়ের ব্যায়াম অনুশীলন করা প্রয়োজন।

এ রোগ থেকে সম্পূর্ণ নিরাময় হতে গেলে যা দরকার তা হলো রোগীর সাহস এবং বাঁচার জন্যে আগ্রহ, মানসিক স্থৈর্য্য ও শারীরিক ব্যায়াম অনুশীলন করা। জীবনের বাকী দিনগুলিতে কখনোই দৌড়ানো, ভারী জিনিষ তোলা, সাঁতার কাটা, হাতুড়ী পেটানো ইত্যাদি কাজ করা চলবে না। কারণ একবার রেহাই পাওয়া গেছে বলেই এ রোগ যে আর আসবে না, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। তাই সকালে বিকেলে বেড়ানো, বাগান করা বা খুব হালকা ব্যায়াম করে শরীরটাকে চালু রাখলে দীর্ঘদিন বাঁচবার সম্ভাবনা।

অনেকের ধারণা এ রোগের কামড় একবার খেলে আর বেশীদিন বাঁচা যায় না। যাদের বংশগত হৃদ্‌রোগের ইতিহাস নেই, তারা রোগমুক্তির পর কুড়ি বছরেরও বেশী বেঁচে জীবন উপভোগ করে গেছে, এমন দৃষ্টান্ত অনেক আছে।

সম্প্রতি নয়, বেশ কয়েক বছর আগেই, সোভিয়েট রাশিয়াতে চিকিৎসকেরা এই রোগে হৃৎপিণ্ডে অস্ত্রোপচার করে সাফল্য অর্জন করেছেন। কৃত্রিম পদ্ধতিতে রোগীর দেহ ও মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালনের ব্যবস্থা রেখে তাঁরা হৃৎপিণ্ডের ক্ষতস্থান মেরামতের ব্যবস্থা করেন। এ পদ্ধতি আরো চালু হলে দুর্দান্ত রোগটি বিজ্ঞানের কাছে কাবু হয়ে পড়বে সন্দেহ নেই।

যন্ত্রণার অনুভূতি কমানোর জন্য চিকিৎসকেরা ইনজেকশন করেন পেথিডিন, মরফিন। নানা উপসর্গ নিরোধের জন্য দেওয়া হয় নর-অ্যাড্রিনালিন, মেফেনটেরিমিন, কুইনিডিন, ডিজিট্যালিস, অ্যামাই-নোফাইলিন, পেরিট্রেট ইত্যাদি ওষুধ। রক্তের জমাট বাঁধা নিরসনের জন্য দেওয়া হয় রক্ততঞ্চন প্রতিরোধক ওষুধ—হেপারিন, ডাইকুমারিন। বলা বাহুল্য, রোগের সূচনাতেই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া আশু কর্তব্য।

করোনারি থ্রম্বোসিসের সঙ্গে আরো দু-একটি রোগের নাম মনে পড়বে—করোনারী অক্লুসন ও মায়োকার্ডিয়াল ইনফারক্সন। করোনারি ধমনীতে অল্প ক্লট জমা হলে রক্ত প্রবাহে অসুবিধা হয়, সত্য, কিন্তু রুদ্ধ হয় না সমস্ত দ্বার। এ অবস্থা হলো করোনারি থ্রম্বোসিসের। ধমনীর মুখ বন্ধ বা occluded হলে তাকে বলা হয় করোনারি অক্লুসন। ধমনীতে রক্ত চলাচল সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে গেলে ঐ স্থানের মাংসপেশী রক্তশূন্য হয়ে মরে যায়; তখন হলো মায়োকার্ডিয়াল ইনফারক্সন। রোগের আক্রমণ থ্রম্বোসিস দিয়ে, সমাপ্তি মায়োকার্ডিয়াল ইনফারক্সনে। কোন ক্ষেত্রে প্রথম আক্রমণেই উপস্থিত হয় শেষের অবস্থা, অর্থাৎ ইনফারক্সন। অচিরেই নেমে আসে মৃত্যুর কালো অন্তহীন যবনিকা।

বয়স যখন পেরিয়ে যায় মাঝ দরিয়া, জীবন যখন আয়াসের তরীতে ভেসে চলে তখনই উঁকি দেয় কালান্তক থ্রম্বোসিস রোগ। পরিমিত আহার, খাদ্যে স্নেহজাতীয় দ্রব্যের স্বল্পতা এবং নিয়মিত শারীরিক ব্যায়াম, সেই সঙ্গে উপযুক্ত মানসিক বিশ্রাম মানুষকে করে তুলবে অধিকতর সংগ্রামী। করোনারি থ্রম্বোসিস রোগের মুখোমুখি না হবার এইটেই একমাত্র পথ সাধারণ মানুষের।

লিউকেমিয়া

লিউকেমিয়া রোগ চিকিৎসা জগতে এখনো দুরারোগ্য বলে মনে করা হয়। যে হতভাগ্য ব্যক্তি এই রোগের কবলগ্রস্ত হবে তার মৃত্যু অবধারিত—কারো বা আগে, কারো বা কিছুদিন পরে। এর নিদানতত্ত্ব জানবার জন্যে চেষ্টা চলছে পৃথিবীর সর্বত্র। এখনও কোন হদিস মেলেনি সঠিকভাবে। তাই এ রোগ আরো আতঙ্কজনক।

ডাঃ ডন নামে জনৈক চিকিৎসক 1839 খৃস্টাব্দে সর্বপ্রথম লিউকেমিয়া রোগে আক্রান্ত রোগীদের রক্ত পরীক্ষা করেন। অবশ্য তারও আগে একবার এ প্রচেষ্টা হয়েছে। এ রোগে রোগীর প্লীহা (Spleen) যায় বেড়ে আর রক্তে শ্বেত কণিকার সংখ্যা খুব বৃদ্ধি পায়। 1845 খৃস্টাব্দে হিউগ্, বেনেট, রুডল্ফ্ এবং ভারচাউ ঐ কথা বলেন। যতদূর জানা গেছে, তাঁরাই প্রথমে এই রোগে মৃত ব্যক্তিদের দেহ ব্যবচ্ছেদ করে ঐরূপ সিদ্ধান্তে আসেন। তখন থেকেই একটা ধারণা প্রায় বদ্ধমূল হতে লাগলো যে, প্লীহা অসুস্থ হয়ে পড়লে পর্যাপ্ত পরিমাণে রক্ত তৈরী হতে পারে না। 1846 খৃস্টাব্দে ফুলার এই কথাকে সমর্থন জানালেন। এর অনেক পরে যখন বিভিন্ন কোষ ও তন্তু রং করবার জন্য প্রয়োজনীয় রঞ্জক পদার্থের ব্যবহার শুরু হলো তখন আবার নতুন করে পরীক্ষা আরম্ভ হলো। এর ফলে সঠিক-ভাবে জানা গেল যে, আগেকার সিদ্ধান্তই ঠিক।

এ রোগের কবল থেকে শুধু মানুষ নয়, ইতর প্রাণীরাও রেহাই পায় না। কেন শ্বেতকণিকার সংখ্যা অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে গিয়ে

মানুষের জীবনে চরম ছেদ নিয়ে আসে তা জানা যায় নি। আমাদের রক্তে প্রতি ঘন মিলিমিটার (cmm) স্থানে শ্বেতকণিকার সংখ্যা 4,000, থেকে 8,000। প্রায় কোন ক্ষেত্রেই 10,000 এর বেশী থাকা উচিত নয়। কিন্তু এ রোগে শ্বেতকণিকার সংখ্যা ঐ পরিমিত স্থানে 1,000,00 থেকে 1,000,000 পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

এ রোগে শ্বেতকণিকার সংখ্যা অস্বাভাবিক বেড়ে যায় বলেই একে বলা হয় রক্তের (বিশেষতঃ শ্বেত কণিকার) কর্কট রোগ। যাই হোক্, মূল বক্তব্যে যাওয়ার আগে শ্বেতকণিকার জন্ম বৃত্তান্ত ও তাদের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন।

শ্বেতকণিকাকে দু'টি ভাগে ভাগ করা চলে ঃ

(1) Agranulocyte (2) Granulocyte,

প্রথম শ্রেণীর কণিকাতে একটি নিউক্লিয়াস এবং সাইটোপ্লাজম্ থাকে। একে আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায় ; (ক) লিম্ফোসাইট (খ) মনোসাইট। Granulocyte শ্রেণীর কণিকাতেও একটি নিউক্লিয়াস থাকে। সেটি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত। তা ছাড়া সাইটো-প্লাজম বিন্দু আকৃতির। এই কণিকাটির আর তিনটি শাখা আছে—

(i) নিউট্রোফিল বা পলিমর্ফোনিউক্লিয়ার

(ii) ইওসিনোফিল

(iii) বেসোফিল

শ্বেত কণিকার উৎপত্তি সম্পর্কে দুটি অভিমত পাওয়া গেছে। প্রথমটি হলো মনোফাইলেক্টিক থিয়োরী, পরেরটি পলিফাইলেক্টিক থিয়োরী। প্রথম মতাবলম্বীরা বলেন যে, শ্বেত কণিকা উৎপন্ন হয়েছে Stem cell বা Haemoeyto blast থেকে।

আর এক দল বলেন যে, শ্বেতকণিকা জন্মে অস্থি-মজ্জা ও প্লীহার রেটিকুলাম কোষ (Reticulum cell) এবং লিম্ফ-নোডে (Lymph-node)। গ্র্যানিউলোসাইট শ্রেণীর শ্বেতকণিকার জন্ম হয় অস্থি-মজ্জার (Bone-Marrow) রেটিকুলাম কোষে। যে ভাবে পূর্ণাঙ্গ একটি শ্বেতকণিকা জন্ম নেয় তার একটি ছক দিচ্ছি।

রেটিকুলাম কোষ → প্রাথমিক শ্বেতকণিকা → মায়েলোব্লাস্ট → মায়েলোসাইট → প্রাথমিক মেটামায়েলোসাইট (Early Meta myelocyte) → পূর্ণাঙ্গ মেটামায়েলোসাইট (Late Meta myelo-cyte) → লিউকোসাইট বা শ্বেতকণিকা।

লিম্ফোসাইট শ্বেতকণিকা দেহের লিম্ফ-নোডের কেন্দ্রস্থল থেকে জন্মগ্রহণ করে। মনোসাইট কণিকা প্লীহা ও লিম্ফ-নোডের রেটিকুলাম কোষ থেকে উৎপন্ন হয়। কখনও বা অস্থি-মজ্জা থেকেও তারা জন্ম নেয়।

পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে আছে এই রোগ। লিউকেমিয়া রোগে মৃত্যুর হার বিভিন্ন দেশে কিরূপ তার সমীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয় 1957 সালে। তাতে দেখা যায়, শ্বেতাঙ্গেরা কৃষ্ণাঙ্গদের থেকে বেশী সংখ্যায় এ রোগে আক্রান্ত হয় এবং তাদের মধ্যে মৃত্যুর হারও বেশী। আবার ইহুদীরা অন্যান্যদের চেয়ে দ্বিগুণ সংখ্যায় আক্রান্ত হয়। এর কারণ সঠিকভাবে জানা যায় নি।

অনেকের মনে সন্দেহ জেগেছে যে, পিতা বা মাতার এই রোগ থাকলে তা সন্তানে বর্তায় কি না? সমীক্ষার ফলে জানা গেছে যে, এ রোগ পুরোপুরি বংশগত না হলেও শতকরা আট ভাগ ক্ষেত্রে এ রোগ যে বংশানুক্রমিকভাবে আসে, তাতে সন্দেহ নেই।

শ্বেতকণিকার যেমন নানা শ্রেণী আছে, লিউকেমিয়া রোগের নামও ঐ সব শ্রেণী অনুসারে হয়েছে।

2

প্রাথমিকভাবে লিউকেমিয়া রোগকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। একটি ক্রনিক, আর একটি অ্যাকিউট। ক্রনিক লিউকেমিয়া রোগ আবার নানা শাখায় বিভক্ত ; যেমন—

1) মায়েলোসাইটিক
2) লিম্ফোসাইটিক
3) মনোসাইটিক
4) লিউকোপেনিক
5) ইয়োসিনোফিলিক
6) বেসোফিলিক
7) নিউট্রোফিলিক
8) প্লাজমা-কোষ (Plasma-Cell)
9) লিউকোসার্কোমা

মনোসাইটিক লিউকেমিয়ার খবর বেশী দিনের নয়। যদিও একে ক্রমিক গোষ্ঠীভুক্ত করা হয়েছে, তাহলেও এটি তা নয়। যেহেতু এই রোগে আক্রান্ত হলে রোগীর অবস্থা কয়েক দিনের মধ্যেই সঙ্কটজনক হয়ে ওঠে।

অ্যাকিউট শ্রেণীর লিউকেমিয়াকেও উপরের বিভাগ অনুসারে ভাগ করা যায়। এ ছাড়া তার আরো কয়েকটি শাখা আছে। তারা হলো—

1) লিম্ফোব্ল্যাস্টিক লিউকেমিয়া
2) ন্যাজেলি টাইপ অব অ্যাকিউট লিউকেমিয়া (Naegeli)
3) শিলিং টাইপ অব অ্যাকিউট লিউকেমিয়া (Schilling)
4) স্টেম সেল লিউকেমিয়া (Stem-Cell Leukaemia)

এ ছাড়া আরো কয়েক ধরণের লিউকেমিয়া আছে, যাদের বলা হয় Mixed Leukaemia। কতকগুলি জটিল ধরণের লিউকেমিয়ার সন্ধান পাওয়া গেছে, অথচ তাদের বিশেষ কোন শাখায় ফেলা সম্ভব হয় নি। এগুলিকে বলা হয় অজ্ঞাত কারণঘটিত লিউকেমিয়া।

1) ক্রমিক মায়েলোসাইটিক লিউকেমিয়া—তেরো বছর বয়সের উপরে যে কোন লোকের (স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে) এই রোগ হতে পারে। পঁয়ত্রিশ থেকে পঞ্চান্ন বছর বয়স্ক লোকেরা বেশী আক্রান্ত

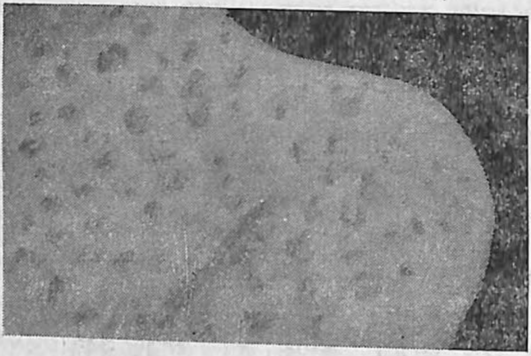
হয়। রোগীদের প্লীহা আকারে বেড়ে যায়। অস্থি-মজ্জা স্বাভাবিক ধর্ম হারিয়ে ফেলে। লিভার বা যকৃৎ বেড়ে শক্ত হয়ে ওঠে।

রোগের প্রথম দিকে রোগীর ওজন হ্রাস পেতে থাকে। অল্পেই তাদের ক্লান্তি আসে। পেটের অসুখ প্রায়ই হয়। প্লীহা বড় হতে থাকার জন্যে পেটও বড় হতে থাকে। রোগ আক্রমণের প্রথম দিকে রক্তাল্পতা না-ও হতে পারে। ধীরে ধীরে তা প্রকাশ পায়। রোজ জ্বর হয়। তবে প্রথম দিকে জ্বর তেমন থাকে না। মাঝে মাঝে 101° ফা থেকে 103° ফা পর্যন্ত জ্বর উঠতে পারে। জ্বর বেশী দিন থাকে না বলে অনেকে এই জ্বরকে সর্দি-জ্বর বা অন্য কোন সাধারণ জ্বর বলে ভুল করে।

রোগ হবার প্রায় ছ'মাস বাদে বুকের স্টারনাম (Sternum) হাড়ে আরম্ভ হয় ব্যথা। দাঁত দিয়ে রক্ত পড়তে থাকে। শেষের দিকে পেটে জল জমে। কপাল থেকে আরম্ভ করে সর্বশরীর ফুলে যায়। এ অবস্থাকে বলা হয় Ascietes এবং ঈডিমা। ফুলে যাবার জন্যে হৃৎপিণ্ডে বেশী চাপ পড়ে। ক্রমাগত চাপ পড়বার ফলে তা হয়ে পড়ে দুর্বল। শ্বাসকষ্টের তীব্রতা পরিলক্ষিত হয়। এ অবস্থায় 'অ্যানজাইনা পেক্টোরিস' নামে হৃৎপিণ্ডের রোগ আসা খুবই স্বাভাবিক। রোগী বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে না, সমস্ত দেহ ফ্যাকাসে হয়ে যায়। রোগ হবার তিন বছরের মধ্যেই রোগীর মৃত্যু অনিবার্য। মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

2) ক্রমিক লিম্ফোসাইটিক লিউকেমিয়া ঃ পুরুষের মধ্যেই সাধারণতঃ এই রোগ বেশী প্রকাশ পায়। স্ত্রীলোকদের যে হয় না তা নয়, তবে পুরুষ-রোগীর সংখ্যা স্ত্রী-রোগীর তুলনায় দ্বিগুণ। শিশুদের এ রোগ প্রায় হয় না বললেই চলে। এ রোগ হলে দেহের সমস্ত লিম্ফ্যাটিক কোষ আয়তনে অতি দ্রুত গতিতে ও অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে যায়। রক্তে লিম্ফোসাইট শ্বেতকণিকার আধিক্য দেখা যায়।

বগল, গলা, ঘাড় ও কনুইএর কাছের লিম্ফ-গ্ল্যাণ্ডগুলি ক্রমশঃ বড় হতে থাকে। 'আমবাত' হলে যেমন জলবিহীন ফোস্কা পড়ে (চিত্র নং 5) ফুলে ওঠে চারদিক, এক্ষেত্রেও তেমনি হয়। যেমন চুলকায়, তেমনি জ্বালা-ভাব থাকে।



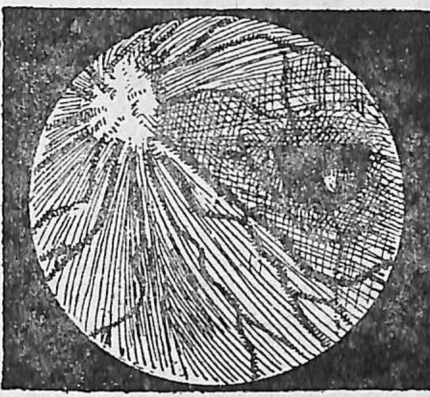
5 নং চিত্র

রোগের ফলে প্লীহা ও যকৃৎ বেড়ে যায়। মস্তিষ্কের সেরিব্রাম অংশে ধমনী ছিঁড়ে যায়। বাতব্যাধি, মেনিনজাইটিস্ প্রভৃতি রোগ এসে উপস্থিত হয়।

চোখের সাদা অংশ যাকে কর্ণিয়া (Cornea) বলা হয়, সেখানকার ও আইরিস (Iris) বা স্ক্লেরার (Sclera) কোষগুলি দ্রুতহারে বেড়ে যেতে থাকে। ফলে চোখে প্রচণ্ড বেদনা অনুভূত হয়। রেটিনার মধ্যে রক্তক্ষরণ হয়ে দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক ঘটনা (চিত্র নং 6)। এ রোগে প্যারোটিড গ্রন্থি ও চোখের ল্যাক্রিম্যাল গ্রন্থি আক্রান্ত হয় বলে কান এবং চোখ উভয় ইন্দ্রিয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এই রোগের ফলে পুরুষের প্রস্টেট গ্রন্থির রোগ হতে পারে। কিড্‌নীর রোগ, বিশেষতঃ ইউরেমিয়া নামে জটিল রোগ, বাড়তি উপসর্গ

রূপে এসে রোগীর মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করে তোলে। অনেক ক্ষেত্রে আবার দেখা গেছে, এ রোগে ভোগবার সময় মিলিয়ারি টিউবার-কিউলোসিস নামে এক ধরণের যক্ষ্মারোগ আক্রমণ করে রোগীর জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছে।



ক্রনিক লিম্ফোসাইটিক লিউকেমিয়াতে রেটিনাতে রক্তপাত হয়।

6 নং চিত্র

এই রোগের কবলমুক্ত হওয়া অসম্ভব ঘটনা। রোগ আক্রমণের পর আঠারো মাস থেকে তিন বছরের মধ্যে মৃত্যু অবধারিত। তবে দু-একটি ক্ষেত্রে এ রোগ নিয়ে দশ পনেরো বছর বেঁচেছে, এমন দৃষ্টান্তও আছে।

3) ক্রনিক এবং অ্যাকিউট মনোসাইটিক লিউকেমিয়া

এ রোগে মনোসাইটের সংখ্যা অত্যন্ত বেড়ে যায়। রোগের উপসর্গগুলি প্রায় আগেকার মতোই। তবে এতে আরও একটি বেশী উপসর্গ থাকে। রোগীর মাড়ি ফুলে যায়। দাঁত দিয়ে রক্ত পড়ে।

মুখের মধ্যে ঘা হয় এবং দাঁতের নীচে প্রায় সর্বক্ষণ রক্তক্ষরণ হতে থাকে। (চিত্র নং 7)



ক্রনিক এবং অ্যাকিউট মনোসাইটিক লিউকেমিয়াতে মুখের অবস্থা

7 নং চিত্র

4) অ্যাকিউট লিউকেমিয়া

এ রোগের আক্রমণ হঠাৎ হয়। সর্দি, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ব্রঙকাইটিস প্রভৃতি উপসর্গ থাকে। পাকস্থলী ও গলায় ঘা হয়। ক্রনিক শ্রেণীর লিউকেমিয়াতে যে সব উপসর্গ থাকে এখানেও তা হয়, তবে প্রতিটি উপসর্গ অত্যন্ত তীব্র ভাবে প্রকাশ পায়। এক সপ্তাহ থেকে দু'মাসের মধ্যে মৃত্যু নিশ্চিত বলে ধরা যেতে পারে। ক্রনিকের ক্ষেত্রে চিকিৎসার কিছু সময় পাওয়া যায়, কিন্তু এর ক্ষেত্রে চিকিৎসা-পদ্ধতির ছক ঠিক করতেই মৃত্যু এসে হাজির হয়। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই এ রোগে আক্রান্ত হ'তে পারে। Acute Lymphatic Leukaemia—সাধারণতঃ পাঁচ থেকে কুড়ি বছরের মধ্যেই এ ধরণের রোগ হয়। অন্যান্য সব ধরণের একিউট লিউকেমিয়া কুড়ির উপরের লোকদেরও হতে পারে।

কত সম্ভাবনাময় তরুণ-তরুণী এরোগের কবলগ্রস্ত হয়ে অকালে পৃথিবী থেকে বিদায় নেয় তার ইয়ত্তা নেই। চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা বলেন সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক পরিবেশের জটিলতা ও আর্থিক অসচ্ছলতা যত বেশী বাড়বে, এই রোগও তত বেশী ছড়িয়ে পড়বে।

এমন কোন চিকিৎসার ব্যবস্থা এখনও চালু হয় নি যাতে ঠেকিয়ে রাখা যেতে পারে লিউকেমিয়া রোগের অনিবার্য পরিণতিকে। তবে একথা সত্য, মানুষ চেষ্টা করে চলেছে। ব্যর্থতার ভিতর দিয়েই আসবে সাফল্যের পুষ্পক রথ। কয়েক ধরণের চিকিৎসা এখন চালু আছে। সংক্ষেপে তার কথা বলছি।

ক্রমিক লিউকেমিয়া রোগে রোয়েন্টগেন বা অন্যান্য তেজস্ক্রিয় রশ্মি খুব ব্যবহার করা হচ্ছে। অস্থি, প্লীহা বা লিম্ফগ্রন্থির উপর এইসব রশ্মি প্রয়োগ করে সুফল পাওয়া যাচ্ছে। যেসব ওষুধ ব্যবহার করা হয় তার একটা তালিকা দিচ্ছি।

1) প্রেডনিসোন	2) প্রেডিনিসোলোন
3) ইউরেথেন	4) আর্সেনিক
5) নাইট্রোজেন মাস্টার্ড	6) ডেমেকোলিন
7) কলচিসিন	8) মায়লেরান
9) লিউকেরান	10) ফোলিক অ্যাসিড
11) পেনিসিলিন	12) অরিওমাইসিন ইত্যাদি

এছাড়া—

1) রোয়েন্টগেন রশ্মি-চিকিৎসা

2) তেজস্ক্রিয় ফসফরাস (P^{32}) প্রয়োগ

3) রক্তদান (Blood transfusion), এ সবের ব্যবস্থাও আছে।

একিউট শ্রেণীর রোগে রোয়েন্টগেন-রে ব্যবহার করা হয় না, যেহেতু তাতে মৃত্যু এগিয়ে আসে। প্রেডনিসোলোন, ফোলিক অ্যাসিড,

লিউকেরান ইত্যাদি ব্যবহার করে রোগ-যন্ত্রণাকে সাময়িকভাবে লাঘব করা যায়।

কোন্ ওষুধে কতটা ফল হয় তার হিসেব এখনও পাওয়া যায় নি। যে হারে বিভিন্ন দেশে এ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যাচ্ছে, তাতে কালক্রমে গুরুতর আশঙ্কা সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা রয়েছে। পৃথিবীর সমস্ত সভ্যদেশে এই রোগের হাতিয়ার তৈরী করবার জন্যে গবেষণা হচ্ছে। চেষ্টা ফলবতী হোক, এই কামনা।

মেনিনজাইটিস

মেনিনজাইটিস শব্দটা শুনলেই ভয় করে। আজকাল কলিকাতা মহানগরীতে এই রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে চলেছে। এই রোগ আক্রমণ করলে রোগীর পরিজনবর্গ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। অনেক সময় এ রকমও ঘটে যে, শেষাবস্থায় রোগ ধরা পড়ে। এই রোগের সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তিমাত্রই জানে যে, এর আবাসস্থল মস্তিষ্কে। একরকম পর্দা মস্তিষ্ককে আবৃত করে রাখে—যার নাম মেনিনজেস। এই আবরণে প্রদাহের সৃষ্টি হলেই মানুষ মেনিনজাইটিস রোগে আক্রান্ত হয়েছে বলা হয়।

সাধারণতঃ সাতটি বিভিন্ন ধরণের মেনিনজাইটিস (Meningitis) রোগের হদিশ পাওয়া গেছে। সেগুলি হচ্ছে ঃ—

1) নিউমোকক্ক্যাল (Pneumococcal)
2) পায়োজেনিক (Pyogenic)
3) মেনিংগোকক্ক্যাল (Meningococcal)
4) টিউবারকিউলাস (Tuberculous)
5) বিনাইন লিম্ফোসাইটিক (Benign Lymphocytic)
6) সিফিলিটিক (Syphilitic)
7) অন্যান্য ধরণের (Other form)

আমরা সাধারণতঃ যে ধরণের মেনিনজাইটিস রোগ দেখতে পাই সেগুলি হচ্ছে মেনিংগোকক্ক্যাল—যার সঠিক নাম সেরিব্রোস্পাইন্যাল মেনিনজাইটিস বলে অনেকে মনে করেন।

যে বীজাণু মস্তিষ্কের এই আবরণকে আক্রমণ করে তার নাম মেনিংগোকক্কাস। আকৃতিতে বীনের (Bean) মত, তবে অতি সূক্ষ্ম।

সেরিব্রোস্পাইন্যাল ফ্লুইডের মধ্যে এরা জোড়ায় জোড়ায় ছড়িয়ে থাকে। 1887 সনে A. Weichsel Baum মেনিংগোকক্কাস বীজাণু আবিষ্কার করেন ; কিন্তু তার আগেই অনেকে এই রোগের বিভিন্ন উপসর্গ সম্বন্ধে একটি সঠিক ধারণা করে নিয়েছিলেন।

মেনিংগোকক্কাস সুস্থ লোকের নাসাপথ দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে। এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচি-কাশির সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে রোগ-বীজাণু বেরিয়ে এসে পার্শ্ববর্তী মানুষের ভিতরে প্রবেশ করে। এই ভাবে এই রোগ ছড়িয়ে পড়ে এবং পরিশেষে মহামারীতে পরিণত হয়।

1805 সালে জেনেভা সহরে এই রোগ মহামারী আকারে দেখা দিয়েছিল। এর বিবরণী প্রকাশ করেন M. Viesseux। অনুমিত হয় যে, এই রোগের ধ্বংসাত্মক ক্ষমতার বিবরণ হয়ত সর্বপ্রথম তিনিই জানান। ইতিহাসের পাতা উল্টে গেলে দেখতে পাওয়া যায় যে, এই রোগ পূর্বে ঘনবসতিপূর্ণ সেনানিবাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। নেপোলিয়ন যখন বিভিন্ন দেশে যুদ্ধে ব্যাপৃত তখন ফরাসী সেনাবাহিনী মধ্যে এই রোগ ভীতি সঞ্চার করেছিল।

1914-15 সালে শীতকালে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ক্যানাডার সেনাবাহিনীর মধ্যে এই রোগ মহামারী আকারে দেখা দেয়—অবশ্য ধীরে ধীরে মৃত্যুর হার হ্রাস পেতে থাকে। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্দের অন্তর্বর্তীকালে আক্রমণের পরিসংখ্যান প্রায় একই রকম ছিল, কেবলমাত্র 1931-33 সালের মধ্যকার সময়ে এই রোগের আক্রমণ কথঞ্চিৎ তীব্র হয়েছিল বলে জানা যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গেই পুরানো দৃশ্যের আবির্ভাব ঘটে। একমাত্র 1940 সালেই সামরিক ও বেসামরিক সংখ্যা মিলিয়ে 12771 জন আক্রান্ত হয়। প্রথম মহাযুদ্দের সময়কার মহামারীর সঙ্গে দ্বিতীয়টির পার্থক্য এই যে, প্রথমবারে সামরিক কর্মচারীই বেশী আক্রান্ত হয়েছিলেন কিন্তু দ্বিতীয়টিতে ঠিক তার বিপরীত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এই রোগে মৃতের

সংখ্যা পূর্বাপেক্ষা কম ছিল। কারণ এই রোগের অন্যতম প্রধান ওষুধ 'সালফা ড্রাগস 1938 সাল থেকেই বেশীরকম চালু হয়েছিল। আমাদের দেশে এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের সঠিক পরিসংখ্যান পূর্বে পাওয়া যেত না। বিদেশের পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে, 1914-18 সালের মহামারীতে ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সে 10,700 জন এই রোগে আক্রান্ত হয়েছিল, 1939-43 সালে এই সংখ্যা ছিল 34,700। প্রথম বারে অসামরিক ব্যক্তিদের মধ্যে 4,136 জন মারা যায়, পরবর্তী মহামারীতে এই মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়ায়—6,916।

এখনও প্রতি বছর এই রোগে মৃত্যুর হার তুচ্ছ করবার মত নয়। কলকাতায় বেলেঘাটা-অঞ্চলের সংক্রামক রোগের হাসপাতালে অনুসন্ধান করলে কলকাতা ও শহরতলীর মধ্যেও এই রোগের বিস্তার যে ভয়াবহ তা প্রকাশ পাবে।

শীত ও বসন্তকালই এর প্রকোপ লক্ষ্য করা যায়। সাধারণতঃ ফেব্রুয়ারী থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত এই রোগ মহামারী রূপে দেখা দেয়। পাঁচ বছর বয়সের নীচেকার ছেলে মেয়েদের বেশী মাত্রায় এই রোগে আক্রান্ত হতে দেখা যায়। রোগীদের মধ্যে অর্ধেকই প্রায় এক থেকে পাঁচ বছরের শিশু। পাঁচ থেকে দশ বছর বয়স্ক ছেলে-মেয়েদের মধ্যে আক্রান্তের সংখ্যা শতকরা পয়ষট্টি। পঁচিশ বছরের বেশী যাদের বয়স তাদের এই রোগে ভোগবার কথা ক্বচিৎ শোনা যায়। তবে সামরিক কর্মচারীদের ক্ষেত্রে এই হিসাব চলে না।

পূর্বেই বলেছি, মেনিনজাইটিস রোগ বললে আমরা মেনিংগোকক্ক্যাল মেনিনজাইটিসকেই বুঝি। এই রোগকে মোটামুটি পাঁচভাগে ভাগ করা হায় ঃ—

1) Ordinary বা acute type
2) Super acute type
3) Fulminating বা Malignant type

4) Mild type

5) Chronic septicaemia without Meningeal sypmtoms.

এ ছাড়া আরও একটা শ্রেণীর নাম উল্লেখ করা যায়। তার নাম হচ্ছে Post-basic Meningitis of infants. এবারে প্রতিটি বিভাগ নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাক।

1) এ ক্ষেত্রে সংক্রমণ কাল নির্ণয় করা শক্ত ব্যাপার। তবে কয়েকটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে এ কথা অনুমান করা হয় যে, এই ধরণের রোগের সংক্রমণকাল চার থেকে পাঁচ দিন। রোগের প্রারম্ভে জ্বর সুরু হয়। প্রথম দিন জ্বর 102° ফাঃ থেকে 104° ফাঃ পর্যন্ত ওঠে। জ্বর আকস্মিকভাবে সুরু হয়, প্রচণ্ড মাথার যন্ত্রণা, তা ছাড়া অস্থিরতা ও বমির ভাব থাকে। বড়দের গায়ের মাংসপেশী প্রায়ই কেঁপে কেঁপে উঠে, ছোটরা প্রায়ই অজ্ঞান হয়ে পড়ে। শিশুদের বমির ভাব কম থাকলেও বড়দের এটা একটা প্রধান উপসর্গ।

দু-চার দিনের মধ্যেই রোগের পূর্ণ লক্ষণ প্রকাশ পায়। বারে বারে বমি হতে থাকে, জ্বরও বেশ বাড়ে, কিন্তু সেই অনুপাতে নাড়ীর গতি তীব্র থাকে না। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস অনিয়মিতভাবে চলে। চোখের তারা প্রসারিত থাকে। রোগী আলো দেখলেই ভয় পায়। গোলমাল বা কোন উত্তেজনাকর আওয়াজ ভাল লাগে না।

অসহ্য মাথাধরা থাকে। রোগী বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে ওঠে। ক্রমে ঘাড় শক্ত হয়ে যায়। পায়ের মাংসপেশী এবং কুঁচকিতে টান ধরে। ক্রমে ক্রমে পিঠও শক্ত হতে থাকে। রোগী শুকিয়ে অস্থিসার হয়ে যায়।

সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসার ব্যবস্থা না করলে মৃত্যু অনিবার্য। রোগী যদি ভালর দিকে যায়, তাহলেও প্রায় কুড়িদিন পর্যন্ত আশঙ্কা থাকে। যদি জ্বর ও নাড়ীর গতি রোগমুক্ত হবার পরেও 14 দিন পর্যন্ত

স্বাভাবিক থাকে, তাহলে বুঝতে হবে যে, পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা নেই। রোগের চিকিৎসা না হলে কয়েক দিনের মধ্যেই রোগী অন্ধ, কালা অথবা পক্ষাঘাতগ্রস্তও হয়ে পারে।

2) সাধারণতঃ মহামারীর সময়ে এই শ্রেণীর রোগ দেখা যায়। রোগী প্রথম থেকেই দুর্বল হয়ে পড়ে। বিকারের লক্ষণ স্পষ্ট থাকে। রাত্রে ঘুম হয় না, মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা থাকে। জ্বর খুব বেশী থাকে—104° ফাঃ থেকে 106° ফাঃ পর্যন্ত। জিভ শুকনা থাকে, চোখের নানা রোগ আরম্ভ হয়। শেষ পর্যন্ত ফুসফুস অকেজো হয়ে যাওয়ায় মৃত্যু অনিবার্য হয়ে ওঠে।

3) এই শ্রেণীর রোগও মহামারীর সময়ই হয়। শিশুদের চেয়ে বয়স্করাই এই রোগে বেশী আক্রান্ত হয়। আকস্মিকভাবে জ্বর, মাথাধরা, বিকার আরম্ভ হয়—কিছুক্ষণের মধ্যেই রোগী অর্ধচেতন অবস্থায় চলে যায়। প্রায় বার ঘন্টার মধ্যে রোগ গুরুতর আকার ধারণ করে। রোগ সঠিকভাবে নির্ণয় করবার আগেই রোগী মারা যায়।

4) মহামারী যখন শান্ত হয়, তখন এই ধরণের মেনিনজাইটিস রোগ সুরু হয়। ইনফ্লুয়েঞ্জার সঙ্গে এই রোগের সাদৃশ্য এত বেশী যে, অনেকেই ভুল করেন। মেনিনজাইটিসের সব লক্ষণ প্রকাশ পায় না, কিন্তু রোগ ধরা না পড়লে মৃত্যু নিশ্চিত।

5) এই রোগে অন্যান্য উপসর্গের সঙ্গে আর্থ্রাইটিস ও চর্মরোগ অতিরিক্ত উপসর্গরূপে দেখা দেয়।

6) 1878 সালে গী ও বার্লো এই শ্রেণীর রোগের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। আগে 6 মাস থেকে আড়াই বছর বয়স্ক শিশুরা এই রোগে আক্রান্ত হতো। আজকাল ঐ বয়সে এ রোগ প্রায় দেখা যায় না বললেই চলে।

এবার টিউবারকিউলার মেনিনজাইটিস সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হবে। দেহের কোন অংশে যক্ষ্মা-বীজাণু অনেক সময় রক্তবাহী ধমনী ও শিরাপথে মস্তিষ্কের আবরণ মেনিনজেসকে আক্রমণ করে। তারই ফলে এই রোগ দেখা দেয়। সচরাচর 2-3 বছরের শিশুরাই এই রোগে ভুগে থাকে।

উপসর্গগুলি ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়। শরীর প্রায়ই অসুস্থ হয় অথচ কোন সঙ্গত কারণ পাওয়া যায় না। শিশু রোগীরা আমোদ-প্রমোদ ভালোবাসে না, তাদের মাথাধরা প্রায় সব সময়ের জন্য লেগে থাকে, খিদে পায় না, কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে, ঘুমের মধ্যে দাঁতে দাঁত ঘষে, প্রায়ই বমি হয়, জ্বরও হয় মাঝে মাঝে, সব সময়ই এক প্রকার অস্থিরতা থাকে।

বড়দের এই সব উপসর্গের সঙ্গে থাকে অবসাদ, বিষাদের ভাব এবং বিকৃত কর্মে প্রবণতা। অনেকের কথা বন্ধ হয়ে যায়। কিছু দিনের মধ্যে মেনিনজাইটিসের অন্যান্য লক্ষণ আত্মপ্রকাশ করে।

সব রকম মেনিনজাইটিস রোগের উপসর্গগুলি প্রায় সমশ্রেণীর। এতক্ষণ রোগ ও তার উপসর্গ নিয়ে আলোচনা হল। এবার চিকিৎসা সম্বন্ধে কিছু বলেই শেষ করবো।

মহামারীর সময়ে ত বটেই, এমনিতেও বাড়ীতে কোন শিশুর মেনিনজাইটিস রোগ হলে অন্যান্য শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের সাবধানে রাখতে হয়। অবশ্য সকলেরই সাবধান হওয়া উচিত। কারণ ত্রিশের অধিক বয়স্ক ব্যক্তিদেরও এই রোগে আক্রান্ত অবস্থায় কলকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হতে দেখা গেছে।

কোন বাড়ীতে এই রোগ হলে সেখানকার অধিবাসীদের প্রত্যহ তিন গ্রাম করে সালফা ডিমিডিন বড়ি, অন্ততঃ তিন দিন খাওয়া উচিত।

রোগ হলে সাধারণতঃ এই সব চিকিৎসা করা হয় ঃ—

1) লাম্বার পাংচার।

2) সালফা থায়াজোল এবং সালফা ডিমিডিন বড়ি।

3) পেনিসিলিন ইনজেকশন।

4) অ্যাসপিরিন বড়ি।

টিউবারকিউলার মেনিনজাইটিস স্ট্রেপটোমাইসিন, পারা-অ্যামিনো স্যালিসাইলিক অ্যাসিড, আইসোনিয়াজাইড প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়।

রোগীকে বারে বারে জল পান করতে দেওয়া হয়। আইসক্রীম ও দুধ খেতে দিতে হয়। যদি মুখ দিয়ে খেতে না পারে, তাহলে নাকের ভিতর নল ঢুকিয়ে 3।4 আউন্স তরল খাবার দেওয়া যেতে পারে। শিরাপথে গ্লুকোজ দেবার ব্যবস্থাও আছে।

জ্বর, প্রচণ্ড মাথাধরা এবং বমি—এই তিন উপসর্গ দেখা দিলেই অবিলম্বে উপযুক্ত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া একান্ত কর্তব্য।

টাইফয়েড

ব্যাকটিরিয়াম টাইফোসাম বা Salmonella Typhosa নামে বীজাণু, টাইফয়েড রোগের সৃষ্টিকর্তা। পাঁচ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর বয়স্ক লোক স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে (তবে পুরুষের সংখ্যা বেশী), সাধারণতঃ এই রোগের কবলগ্রস্ত হয়। আক্রমণের কাল সাধারণতঃ শরৎ। বসন্তে যেমন বসন্ত রোগ, শরতে তেমনি টাইফয়েড। তবে অন্য কোন সময় এ রোগ হয় না এমন কথা নয়। পৃথিবীতে এমন কোন দেশের নাম জানা গেছে কি না জানি না যেখানে এ রোগ নেই। সরাসরি রোগী থেকে অথবা তার ব্যবহৃত খাবার, জল, বিশেষতঃ দুধ, মাখন ইত্যাদি থেকেও অপরে সংক্রামিত হতে পারে। রোগীর বমি এবং মলমূত্রের উপর মাছি বসলে, সেই মাছির সর্বাঙ্গে লেগে থাকে রোগজীবাণু। তার দ্বারা রোগ সংক্রমণ সহজেই হয়ে থাকে। এ ছাড়া পানীয় জলের পুকুর থেকে রোগ ছড়াতে পারে। গ্রামাঞ্চলে যেখানে পুকুরের উপর নির্ভর করতে হয়, অধিকাংশ কাজের জন্যে, সেখানে একবার পুকুরের জল দূষিত হ'লে রোগ মহামারী আকারে দেখা দিতে পারে।

রোগের সংক্রমণ কাল সাত থেকে একুশ দিন, সাধারণতঃ চোদ্দ দিন। রোগের প্রারম্ভে রোগী পিঠ ব্যথা, কোষ্ঠকাঠিন্য, অবসাদ, মাথাধরা, মাথাঘোরা, শ্বাসকষ্ট, জ্বর জ্বর ভাব, অনিদ্রা ইত্যাদি উপসর্গের কথা বলে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জ্বর হতে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে হঠাৎ জ্বর বেড়ে যায়, বমি হয়, শরীরে খেঁচুনী সরু হয় ; রোগী ভুল বকতে থাকে।

প্রথম সপ্তাহে রোগীর মুখ লালচে থাকে, সাদা আবরণে আচ্ছাদিত থাকে তবে জিভের ডগা বেশ পরিষ্কারই থাকে। চোখের তারা বড় বড় দেখায়। পেটে ব্যথা ও অস্বস্তির কথা শোনা যায়। সন্ধ্যা যত এগিয়ে আসে জ্বর তত বাড়তে থাকে, সকালের দিকে আধ বা এক ডিগ্রি কমে। সপ্তাহের শেষে জ্বরের মাত্রা 102° থেকে 103° ফাঃ পর্যন্ত থাকে। নাড়ীর গতি হয় দুর্বল। পেট একটু ফুলে যায়, পাকস্থলী বা অন্ত্রে বায়ু থাকার জন্যে এমন হয়। প্লীহা সামান্য বড় হয়। সপ্তম দিনে টাইফয়েডের দাগ (গোলাপী রঙের ছোপ) পড়তে পারে।

দ্বিতীয় সপ্তাহে রোগী আরো দুর্বল হয়ে পড়ে। মাথা ধরা তীব্র হয়, বধিরতাও আসতে পারে। জিভ থাকে শুকনো এবং তার মধ্যিখানে সাদা ময়লা থাকে, তবে দু'পাশ ও ডগা পরিষ্কার থাকে। অনিদ্রা বেশ কষ্টকর হয়ে ওঠে এবং বিকারও হতে পারে। জ্বর 101° থেকে 103° ফাঃ পর্যন্ত ওঠে এবং নাড়ীর গতি কিছুটা তীব্র হয়। এই সময়ে রোগীর পেটের অসুখ হয়।

তৃতীয় সপ্তাহে রোগীর অবস্থা আরো খারাপ হয়। তবে এর পর থেকে রোগী ক্রমে আরোগ্যের পথে যায় যদি ওষুধ পড়ে। চতুর্থ সপ্তাহে জ্বর নেমে যায়। জ্বর নামার সঙ্গে সঙ্গে অন্য উপসর্গগুলি ধীরে ধীরে কমতে থাকে। এক সপ্তাহ স্বাভাবিক থাকার পরে জ্বর আবার হঠাৎ বেড়ে গিয়ে দেহের তাপ আগেকার মত হ'তে পারে। আবার প্লীহা বড় হতে পারে, গায়ে ছোপ ধরতে পারে অর্থাৎ রোগ ফের আক্রমণ করেছে বুঝতে হবে।

টাইফয়েড নানা শ্রেণীর—

(1) Mild, (2) Apyrexial, (3) Severe, 3(ক) Haemonhagic, 3(খ) Pneumo-typhoid, 3(গ) Nephro-

typhoid, 3(ঘ) Meningo-typhoid। টাইফয়েড রোগে অপর কতগুলি বাড়তি রোগও উপসর্গরূপে দেখা দিতে পারে। তার মধ্যে অধিকাংশই শ্বাসযন্ত্র সম্পর্কীয় রোগ যথা—ল্যারিঞ্জাইটিস, ব্রঙ্কাইটিস, তৃতীয় সপ্তাহে নিউমোনিয়া, প্লুরিসি ইত্যাদি। নানাধরণের হৃদরোগ হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। টাইফয়েড রোগের জন্য গলষ্টোন বা পিত্তথলিতেও পাথুরী হ'তে পারে।

বর্তমান কালে ক্লোরামফেনিকল আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে টাইফয়েড রোগে মৃত্যুর হার কমে শতকরা এক ভাগে দাঁড়িয়েছে।

এই রোগকে প্রতিরোধ করবার ব্যবস্থাও আছে। সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করলে রোগ হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় থাকে না। তা হলো টাইফয়েডের ভ্যাকসিন গ্রহণ করা। প্রতি বছর না হলেও, এক বছর অন্তর ডাক্তারের কাছে গিয়ে এই রোগের প্রতিষেধক গ্রহণ করা সকলেরই উচিত। কি পরিমাণ ভ্যাকসিন নিতে হবে তা চিকিৎসকই নির্ধারণ করে দেবেন।

রোগীকে সম্পূর্ণ পৃথক ঘরে রাখতে পারলে ভাল হয়। অন্ততঃ দু'-সপ্তাহ ধরে তাপমাত্রা স্বাভাবিক না থাকলে রোগীকে বিছানা ছেড়ে উঠতে দেওয়া উচিত নয়। রোগের ওষুধ ক্লোরামফেনিকল। চিকিৎসক এর মাত্রা নির্দিষ্ট করে দেন বিভিন্ন রোগীর ক্ষেত্রে। এর সঙ্গে থাকে ভাইটামিন এবং অন্যান্য ওষুধ। যেমন মাথাধরা বন্ধ করবার জন্যে অ্যাসপিরিন, বমি বন্ধ করবার জন্যে অ্যাভোমিন বা অন্য ওষুধ। ক্লোরামফেনিকলের সঙ্গে অরিওমাইসিন বা টেরামাইসিনও দেওয়া হয়। ওষুধগুলি এক সঙ্গে প্রয়োগ করলে কাজ ভাল হয় বলে অনেকে মনে করেন। ওষুধ চলে প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে। শুধু রোগীর নয়, অন্য সকলের খাবার জল, দুধ ইত্যাদি খুব ভাল করে ফুটিয়ে নিয়ে পান করা উচিত। মল-মূত্রে নির্বীজক পদার্থ ঢেলে তা

সাবধানে পরিষ্কার করা প্রয়োজন। 1/20 কার্বলিক অ্যাসিড লোশন এক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে। রোগের সূত্রপাত থেকেই উপযুক্ত চিকিৎসকের আশ্রয় নেওয়া উচিত। নিজের ডাক্তার নিজে হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

পীতজ্বর বা ইয়োলো ফিভার

পীতজ্বর ম্যালেরিয়ার সমগোত্রীয় হলেও তা এক রহস্যময় অধ্যায় রচনা করে আছে। এর ধ্বংসশক্তি ম্যালেরিয়ার থেকে অনেক বেশি। এক্ষেত্রেও একধরণের মশা-ই রোগের বীজাণুবাহক। খুব সম্ভবতঃ এই রোগ সর্বপ্রথম দেখা যায় আফ্রিকা মহাদেশে। নিগ্রো ক্রীতদাসদের মারফৎ এ রোগের বীজাণু আমেরিকা, দক্ষিণ ইয়োরোপ ও গ্রীষ্ম-মণ্ডলের অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে। যে সব স্থানের অধিবাসীরা এই রোগের কবলগ্রস্ত হয়েছে তা হলো—বেলজিয়াম-কঙ্গো নদের অববাহিকা থেকে সুরু করে ইউরোপের স্পেন, ইংল্যাণ্ড পর্যন্ত তাবৎ দেশ, আর্জেন্টিনার বুয়েনস এয়াস থেকে আরম্ভ করে উত্তর আমেরিকার নিউইয়র্ক, বোষ্টন, কুইবেক পর্যন্ত সুবিস্তৃত অঞ্চল, দক্ষিণ ও পশ্চিম আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকার জঙ্গল।

বিগত 1715 সালে যখন ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে পীতজ্বরের আক্রমণ দেখা দিল তখন ডাঃ লুগেস তার এক বিবরণ দেন। খুব কাঁপুনির সঙ্গে প্রবল জ্বর, মাথা-পিঠ-হাত ও পায়ে অসহ্য ব্যথা, মানসিক অবসাদ, প্রবল তৃষ্ণা, অস্থিরতা, বমি ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়। কয়েকদিন বাদে ব্যথা ও জ্বর কমে যায় সত্য, কিন্তু চোখ ও শরীরের রং হলদে হতে থাকে। তখন থুথুর সঙ্গে রক্তও পড়ে। ক্রমে রোগীর দেহ ঠাণ্ডা হতে থাকে এবং মৃত্যুর পরোয়ানা এসে হাজির হয়।

এ রোগে শরীরের রং ও চোখের সাদা অংশ হল্‌দে হয়ে যায় এবং এ রোগ সুরু হয় প্রবল জ্বর নিয়ে, বোধ হয় এ কারণেই এর নামকরণ হয়েছে পীতজ্বর।

পীতজ্বরের আক্রমণের বেশ কয়েকটি কাহিনী আছে। সম্রাট নেপোলিয়নের 30 হাজার সৈন্য, 1800 সালে, বীরদর্পে হাইতি দ্বীপ অধিকারের জন্য অগ্রসর হয়। হঠাৎ দেখা দিল পীতজ্বর তাঁর সৈন্যদের মধ্যে। তার ফলে মারা গেল 23 হাজার সৈন্য। পূর্বে জাহাজের নাবিকদের মধ্যে এ রোগ সম্পর্কে সংস্কার-গত আতঙ্ক ছিল। 'ফ্লাইং ডাচম্যান' এর কাহিনীতে আছে—কোন একটা জাহাজকে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে যেতে অনুমতি দেওয়া হয়নি, যেহেতু ঐ জাহাজের নাবিকরা কোন বিশেষ হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হওয়াতে তাদের মধ্যে নাকি পীতজ্বরের বিস্তৃতি ঘটেছিল।

বিগত 1838 সালে, সিয়েরালিওন থেকে গাম্বিয়া শহরে এই রোগের বীজাণু আসে ও শহরের প্রায় অর্ধেক লোক মৃত্যুর কালগ্রাসে পতিত হয়। একসময়ে এ রোগ চিকিৎসকদের বিমূঢ় করে তুলেছিল যেহেতু তাঁরা লক্ষ্য করেছিলেন একজনের এ রোগ হওয়ার প্রায় 14-15 দিন বাদে আর একজন আক্রান্ত হয়। এর কারণ বের করবার জন্যে অনেক প্রচেষ্টা হতে থাকে। জ্যামাইকার দুজন ডাক্তার, উইলিয়ম ও বেনেট, স্ব স্ব মত প্রতিষ্ঠার জন্য এমন উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন যে শেষ পর্যন্ত দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। যুদ্ধে দু'জনেই মৃত্যু বরণ করেন।

আলাবামার ডাঃ নট তাঁর পরীক্ষার কথা সংবাদপত্রে প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন মশা-ই পীতজ্বর ও ম্যালেরিয়ার বীজাণু-বাহক। তিনি তখন পাত্তা পেলেন না। পরে হাভানার ডাঃ কার্লোস ফিনলে, ডাঃ নটকে সমর্থন জানিয়ে বললেন যে, 'এডিস ইজিপ্টি' নামে একশ্রেণীর মশা জলাভূমি থেকে আসে এবং তারা পীতজ্বরের ভাইরাস বহন করে। দুঃখের কথা ডাঃ ফিনলেও আমল পেলেন না। এর অনেকদিন বাদে ডাঃ রস ভারতবর্ষে এসে যখন ম্যালেরিয়া সম্পর্কে গবেষণা সুরু করলেন তখন তিনি দেখলেন ডাঃ নট ও ডাঃ ফিনলে সত্য কথাই বলছেন।

একসময়ে আমেরিকার বাণিজ্য পোতগুলিতে পীতজ্বরে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়তে থাকে। কর্তৃপক্ষ তখন বাধ্য হয়ে একটা কমিশন বসালেন। রোগীদের জামা-কাপড়, কম্বল, গিনিপিগের দেহে জড়িয়ে রাখা হলো। দেখা গেল তাদের এ রোগ হয় না। পরে ডাঃ লিজার ও ডাঃ কেরল (1866-1900) 'এডিস ইজিপ্টি' মশার দংশন নিলেন নিজেদের দেহে। দু'জনেরই ঐ রোগ হলো। লিজার মারা গেলেন।

তারপর থেকে প্রমাণিত হলো যে, মশা রোগীর রক্ত শুষে নিলে তাদের দেহে সারা জীবন ধরে পীতজ্বরের ভাইরাস বাসা বেঁধে থাকতে পারে। সে সময় আল্ট্রা মাইক্রোসকোপের প্রচলন না হওয়াতে এই কমিশন ভাইরাসের কোন সন্ধান পান নি। অনেক দিন বাদে তার সন্ধান পেলেন ডাঃ নাগুচি। দুর্ভগ্যক্রমে তিনি নিজেই মারা গেলেন এই রোগে।

দক্ষিণ আমেরিকা ও পশ্চিম আফ্রিকা থেকে সংবাদ পাওয়া গিয়েছিল যে, মশা না থাকা সত্ত্বেও সেখানে এ রোগ মহামারী আকারে দেখা দিয়েছে। সেখানকার জঙ্গলের অধিবাসীদের অধিকাংশই এই রোগের কবলগ্রস্ত হয়েছিল, অথচ সেখানে ঐ মশা নেই। তাহলে কেমন করে রোগ এল? অনুসন্ধান করে জানা গেল যে, এ রোগের ভাইরাসের আক্রমণে স্থানীয় অনেক বানর মারা গেছে। অর্থাৎ বানরেরাও এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে দেখা গেল এবং এই রোগাক্রান্ত বানরেরা গ্রামের মধ্যে ঢুকে গ্রামবাসীদের ক্ষেত-খামারে, বাগানে অভিযান চালানোর ফলেই ঐ স্থানে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা পীতজ্বরকে তিনভাগে বিভক্ত করেন—শহুরে, গ্রাম্য ও জংলী। এডিস ইজিপ্টি মশা প্রথম দুটি শ্রেণীর ভাইরাস বহন করে। তৃতীয় শ্রেণীর রোগের বীজাণু-বাহক মশা, পশু-সংরক্ষণাগার থেকে আসে।

সব শ্রেণীর রোগেরই উপসর্গ মোটামুটি এই রকম—পাণ্ডুরোগ, ইউরেমিয়া, চর্মরোগ, হিক্কা, বিকার ইত্যাদি।

পরীক্ষাগারে ইঁদুরের দেহে পীতজ্বরের ভাইরাস প্রবেশ করিয়ে এবং পরে তাদের তন্তু অনুশীলন করে এ রোগের ভ্যাকসিন আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে।

সাম্প্রতিক কালে আমেরিকাতে দু'টি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে। 1948 সালে পানামা অঞ্চলে পীতজ্বর মহামারী আকারে দেখা দেয়। এর পর থেকে পানামার উত্তরাংশে কোষ্টারিকা, নিকারাগুয়া, হণ্ডুরাসে প্রতিবছর এই রোগে অনেক লোক মারা যেতে থাকে। 'ডেকার' এবং '17-ডি', এই দুই ধরণের প্রতিষেধক ব্যবহার করে রোগের আক্রমণ বন্ধ করা সম্ভব হয়।

1954 সালে ত্রিনিদাদে প্রায় চল্লিশ বছর পরে পীতজ্বর মহামারী আকারে দেখা দেয়। অনেক প্রয়াসেও ঐ অঞ্চলে এডিস ইজিপ্টি মশকদল সম্পূর্ণ ধ্বংস করা সম্ভব হয় নি। কঙ্গো ও আমাজন নদীর অববাহিকায় ঘন ও বৃষ্টিছায়াচ্ছন্ন উষ্ণ মণ্ডলে এডিস ইজিপ্টি মশা অনেক আছে এবং থাকবেও।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বিশেষভাবে চেষ্টা করছে আমেরিকা মহাদেশ থেকে এজাতীয় মশা একেবারে বিনাশ করতে। আফ্রিকা ও এশিয়া থেকেও এদের ধ্বংস করবার জোর প্রচেষ্টা চলছে। বিজ্ঞানীরা বলেন যে, পূর্ব-গোলার্ধে মশক অভিযানের আগে সেখানকার মশককুলের বাসস্থান ও প্রকৃতি সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা একান্ত প্রয়োজন।

ডেঙ্গু

বাংলাদেশে, বিশেষতঃ কলকাতায় ও তার শহরতলীতে ডেঙ্গু রোগ আজ আর অপরিচিত নয়, বরং খুব পরিচিত বলা যেতে পারে। ডেঙ্গুজ্বর হয়নি এমন বাড়ী কমই আছে। জ্বর আর তার সঙ্গে পিঠে ও হাত-পায়ে প্রচণ্ড ব্যথা, এই হলো ডেঙ্গুর লক্ষণ। ডেঙ্গু চলে গেলেও দীর্ঘদিন তার স্বাক্ষর রেখে যায়। দুর্বলতা ও হাত-পায়ে প্রায়ই 'খিল ধরা', দীর্ঘকাল পর্যন্ত থেকে যায়।

কেন এ রোগ হয় ? এক ধরণের 'ভাইরাস' এই রোগের কারণ। মানুষের রক্তে গিয়ে বংশ বৃদ্ধি করলেই আর রেহাই নেই। একজন থেকে আর একজনে রোগ সংক্রামিত হয় মশার মাধ্যমে। মশার দেহে ডেঙ্গুজ্বরের ভাইরাস কিছু বৃদ্ধি পায়, তখন এই মশা কাউকে কামড়ালে তার এ রোগ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। মশার নাম এডিস ঈজিপ্টি (Aedes aegypti)। এতে প্রাণহানির সম্ভাবনা খুব কম হলেও একেবারে যে নেই তা নয়। এ থেকে ফুসফুসের রোগ হতে পারে।

এরোগের সংক্রমণকাল 4 থেকে 10 দিন। হঠাৎ কাঁপিয়ে জ্বর আসে। মাথা ও চোখে যন্ত্রণা হয়। পিঠের নীচের দিকে ও পায়ে অসহ্য যন্ত্রণা আরম্ভ হয়। মুখ রক্তাভ, চামড়া শুকনো ও গরম হয়।

তৃতীয় দিনে ঘাম হতে থাকে, কখনো বা নাক দিয়ে রক্ত পড়ে বা পেটের অসুখ হয়। কিন্তু তাপ কমতে থাকে এবং রোগী অনেকটা সুস্থ বোধ করে। পঞ্চম দিনে জ্বর আবার 100°ফাঃ উঠে গিয়ে 24 ঘন্টা সেইভাবে থাকতে পারে। সবাঙ্গে ব্যথা সুরু হয় এবং গায়ে অনেকটা হামের মত লাল ছোপ ধরা ঘামাচির আকারে গুটি বেরোয়। একে

ঠিক গুটি বলা চলে না। গায়ে স্থানে স্থানে লালরঙের ছোপ ফুটে ওঠে (Rash)। হাতের চেটোর দুদিকে, কোমরে, হাতে, পায়ে এগুলি বেরোয়। 2 থেকে 3 দিনের মধ্যে এগুলি আবার মিলিয়ে যায়।

এর প্রতিকার করতে হলে প্রথমেই মশা তাড়াবার ব্যবস্থা করতে হবে। মশক-নাশক স্প্রে ব্যবহার করতে হবে, মশারী টাঙ্গিয়ে শুতে হবে। লাল ছোপ মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত রোগীকে বিছানায় থাকতে হবে। হাত-পায়ের যন্ত্রণা সাময়িকভাবে কমানোর জন্য, 'নোভালজিন' বড়ি, মাথাধরার জন্যে এ. পি. সি বা কোডোপাইরিন বড়ি, এ সব খাওয়ান যেতে পারে। এর সঙ্গে আরো কিছু ওষুধের প্রয়োজন হতে পারে, তার জন্যে যেতে হবে চিকিৎসকের কাছে।

ফুড পয়জনিং

খাদ্য জীবনধারণে অপরিহার্য আবার অবস্থা বিশেষে এই খাদ্যই আমাদের নিয়ে যায় মৃত্যুর দিকে। গরীব দেশের লোক ক্ষুধার জ্বালায় যা পায় তাই মুখে পুরে দেয়। পেটের জ্বালা থামাতে গিয়ে প্রাণটাকেই খোয়াতে বসে, বিষাক্ত খাদ্য গ্রহণ করে। খাদ্য বিষাক্ত হতে পারে ভিনভাবে। চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা বলেন দুটি বিভিন্ন কারণে মানবদেহে খাদ্যদ্রব্য গ্রহণের ফলে বিষক্রিয়া ঘটতে পারে।

প্রথমেই বিষাক্ত খাদ্যের কথা মনে হবে। ভুল করে আমরা অনেক খাবার খেয়ে থাকি যা প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত বিষাক্ত, আমাদের দেহের পক্ষে অতি অশুভ। বিষাক্ত খাদ্যদ্রব্যের জন্যে আমাদের দেহে যে বিষক্রিয়া হয় তাকে বলা হয় এণ্ডোজেনাস বিষক্রিয়া।

যে বিষক্রিয়া ঘটে বাইরের বীজাণু আসার জন্যে তাকে বলা হয় এক্সোজেনাস বিষক্রিয়া। বিষাক্ত ছত্রাক বা কোন বিশেষ রাসায়নিক দ্রব্য মিশে খাদ্যকে বিষাক্ত করে তুলতে পারে।

এমন দেখা গেছে যে, ব্যাঙের ছাতা যা খাদ্য ছত্রাক হিসাবে আমরা বাড়ীতে এনে পরিপাটি করে রান্না করে খাই, ভুল নির্বাচনের জন্য তা গ্রহণ করে ভয়ানক বিষক্রিয়া সংঘটিত হয়েছে। অনেক সময় এর ফলে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। প্রশ্ন উঠতে পারে ঐ ছত্রাকের মধ্যে কোনটা বিষাক্ত, আর কোনটা নিবিষ, তা বুঝবো কেমন করে? এ প্রশ্নটি নিঃসন্দেহে জটিল! কাজেই কোন অচেনা জাতের ছত্রাক না খেলেই ভাল হয়।

দু'টি বিষাক্ত জাতের ছত্রাকের কথা বলবো। একটির নাম অ্যামানিটা ফ্যালোইডেস। এর মধ্যে থাকে ফ্যালিন বা অ্যামানিটা

বিষ। ছোটরা খেলেই তীব্র বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়। বাচ্চাদের মধ্যে এ বিষক্রিয়া-জনিত মৃত্যুর হার খুব বেশী। এ জাতীয় ছত্রাক খাবার পর চার থেকে পাঁচ ঘণ্টার মধ্যেই উপসর্গ দেখা দেয়। বমি, পেট ব্যথা, এবং দাস্ত সুরু হয়। বমি ও মলের সঙ্গে শ্লেষ্মা এবং রক্ত পড়তে পারে। কিছুক্ষণ বাদে এগুলি বন্ধ হয়, কিন্তু দু-একদিনের মধ্যেই রোগী ন্যাবা রোগে আক্রান্ত হয়। অঙ্গুলের ডগা নীল হয়ে যায়। হাত-পা ঠাণ্ডা থাকে।

বিষের আক্রমণ তীব্র হ'লে রোগী তৎক্ষণাৎ অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে, আর সেই অচৈতন্য অবস্থার মধ্যেই বাজে মৃত্যুর ঘণ্টাধ্বনি। বিষক্রিয়া অপেক্ষাকৃত কম হলেও রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হতে প্রায় এক মাস সময় লাগে।

আর এক ধরণের বিষাক্ত ছত্রাকের কথা বলবো—তা হলে অ্যামানিটা মাসকেরিয়া। এর মধ্যে থাকে মাসকেরিন জাতীয় বিষ। এর অতি সামান্য অংশ পেটে গেলেই মাদকতা আসে। শোনা যায় সাইবেরিয়া অঞ্চলের চাষীরা এই ছত্রাক মাদকদ্রব্য রূপে ব্যবহার করতো। তবে বেশী মাত্রায় খেলে, দুই থেকে ছয় ঘণ্টার মধ্যে দেহে বিষক্রিয়ার লক্ষণ দেখা দেয়। মুখ দিয়ে বেরোয় গাঁজলা, অনবরত ঘাম হ'তে থাকে আর বমি ও দাস্ত আরম্ভ হয়। মাথা ঘুরতে থাকে, চোখের তারা হ'য়ে যায় ছোট। তাই রোগী স্পষ্টভাবে কোন কিছু দেখতে পায় না। অনেক সময় রোগীকে প্রলাপ বকতেও দেখা গেছে। এ জাতীয় বিষক্রিয়ায় মৃত্যু সচরাচর হয় না বললেই চলে।

কয়েকধরণের মাছ আছে যা আমাদের শরীরের পক্ষে খুব বিষাক্ত। জাপানের হ্রদে ও সমুদ্রে 'টেট্রডন' নামে একধরণের মাছ এই জাতীয়। ভারত মহাসাগর এবং জাপান সাগরে আরও কয়েক জাতের বিষাক্ত মাছের সন্ধান পাওয়া গেছে। সেগুলি খেলে পেটের অসুখ এবং স্নায়বিক বিকলতা দেখা দেয়। এখানে বিষাক্ত পটকা মাছ খেয়ে জীবনহানির কথা প্রায়ই সংবাদপত্রে দেখা যায়।

কোন কোন সময় লোকেরা ভুল ক'রে গাছের বিষাক্ত অংশ খাদ্যবস্তু বলে মনে করে। অ্যাকোনাইট গাছের শিকড়কে অনেকে মূলোর শিকড় ভেবে খেয়ে বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে, এমন দৃষ্টান্ত বহু আছে। আলু যদি উপযুক্ত পরিবেশে না সংরক্ষিত হয়, তাহলে তার মধ্যে এক প্রকার অ্যালক্যালয়েড—সোলানিন, উৎপন্ন হয়। তা বিষাক্ত। এক জাতীয় বীজাণুর সাহায্যে আলুর মধ্যে এই বিষাক্ত বস্তুটি গঠিত হয়। এই আলু খেলে কলেরার লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়।

এবারে আর একধরণের বিষক্রিয়ার কথা আলোচনা করবো। ডাক্তারী ভাষায় তাকে বলা হয় ল্যাথিরিজম্। এতে মেরুরজ্জু পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়। প্রথমে ইটালীতে, পরে ভারতের উত্তর বিহার এবং যুক্তপ্রদেশ, ফ্রান্স, আলজিরিয়া ও পারস্যেও এই জাতীর বিষক্রিয়ার কথা শোনা গেছে। আমাদের দেশে অনেক সময় খেসারি ডাল খাবার পরে এইরূপ বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হ'তে দেখা যায়। ফ্রান্স, ইটালী, আলজিরিয়া, স্পেন, উত্তর আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের বিভিন্ন ধরণের মটর ডাল (chick-pea) থেকেও খেসারি ডালেরই অনুরূপ বিষক্রিয়া হয় —সেইরকম সংবাদ পাওয়া গেছে। কিন্তু কেন যে বিষক্রিয়া হয় তার সঠিক খবর জানা যায় নি। খাদ্যাভাব ঘটলে ঐ সব দেশে সাদা আটার সঙ্গে মটর ডালের (chick-pea) গুঁড়ো মিশিয়ে রুটি তৈরি করে অনেকে খায়। সেই সময় ঐরূপ বিষক্রিয়ার ফলে অনেক লোক মারা গিয়ে থাকে। আমাদের দেশে খেসারির ডাল বা ঐ ডালের ছাতু খাবার পর অনেকে পিঠে ব্যথা অনুভব করে। এমন দেখা গেছে যে, রাত্রে খেসারির ডাল খেয়ে পরের দিন সকালে গা-হাতের ব্যথায় বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে না। পায়ের মাংসপেশী শক্ত হ'য়ে যায়। হাত-পা নাড়ানো যায় না। উরুর মাংসপেশী অকেজো হ'য়ে পড়ে। রোগীর চীৎকারে পরিজনদের শান্তি ভঙ্গ হয়। তার উপর রোগীর মল-মূত্রাদির পরিমাণ কমে যাওয়াতে তার দৈহিক অস্বস্তি আরও বেড়ে যেতে থাকে। এমন কি এ থেকে অনেক ক্ষেত্রে প্রজনন

ক্ষমতা হ্রাস পে'য়ে বন্ধ্যাত্ব পর্যন্ত আসতে পারে।

বিষাক্ত খাদ্যদ্রব্য খেলে বিষক্রিয়া তো হবেই, কিন্তু বাইরের থেকে বীজাণু, বিষাক্ত ছত্রাক বা কোন রাসায়নিক পদার্থ মিশেও খাদ্য-দ্রব্যকে করে তোলে বিষাক্ত। আর তার অনিবার্য পরিণতি বিষক্রিয়া। Salmonella বা অন্যান্য ধরণের বীজাণু খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে পেটে গেলে বিষের ক্রিয়া শরীরে প্রকাশ পায়।

বিভিন্ন রোগের বীজাণু খাদ্যে বা পানীয়ে প্রবেশ করলে সেই সব রোগ সুস্থ দেহে আক্রমণ চালাতে পারে। এ ক্ষেত্রে টাইফয়েড, প্যারাটাইফয়েড, কলেরা, যক্ষ্মা, স্কারলেট জ্বর, অ্যামিবাঘটিত আমাশয়, ব্যাসিলারি ডিসেন্ট্রি প্রভৃতি রোগের নাম উল্লেখযোগ্য।

অপরিষ্কার জিনিষপত্র দিয়ে রান্না করলে বা অপরিচ্ছন্ন হাত দিয়ে খাবার তৈরী করলে খাদ্য বিষাক্ত হতে পারে। গয়লার যদি যক্ষ্মা বা অন্য কোন সংক্রামক ব্যাধি থাকে তাহলে সে যে দুধ সরবরাহ করে তার মধ্যে ঐ সব রোগের বীজাণু থাকা খুবই স্বাভাবিক।

এমনকি রোগগ্রস্ত জীবজন্তু থেকেও সতর্ক থাকতে হবে। যে সব জীবজন্তুর মাংস আমরা আহার্যরূপে গ্রহণ করি তাদের কারো অ্যানথ্রাক্স, একটিনোমাইকোসিস, ক্রিমি প্রভৃতি রোগ থাকলে তা আমাদের দেহেও সংক্রামিত হ'তে পারে। যে সব গরুর যক্ষ্মারোগ থাকে, তাদের দুধ খে'লে ঐ রোগ হবার প্রবল সম্ভাবনা থাকে, একথা আমরা ভুলে যাই। টিনের কৌটাতে যেসব খাদ্য সংরক্ষিত থাকে সেগুলি সহজেই বিষাক্ত হ'তে পারে। বিশেষতঃ যদি খাদ্যবস্তু তরল হয়, তাহলে টিন-এর রাং-ঝালের সঙ্গে মিশে বিষাক্ত হয়।

বাজারে অনেক গ্লুকোজ বেশ সস্তায় বিক্রী হয়। খুব অল্প মাত্রায় হলেও সেই সব গ্লুকোজের মধ্যে আর্সেনিক থাকে। এই গ্লুকোজ খেলে বিপদের সম্ভাবনা।

পুরোনো সীসের নলের ভিতর দিয়ে পানীয় জল আসার সময়

জল সীসা দ্বারা দূষিত হ'তে পারে। অনেক ক্ষেত্রে বোরিক অ্যাসিড, ফর্ম্যালিন, স্যালিসাইলিক অ্যাসিড প্রভৃতির সাহায্যে খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা হ'য়ে থাকে। এই সব দ্রব্য খাবারের সঙ্গে মিশে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে।

বীজাণু-ঘটিত বিষক্রিয়াকে আগেকার দিনে 'টোমেন পয়জনিং' বলা হতো। আগে ধারণা ছিল যে, আমিষজাতীয় খাদ্য নষ্ট হলে তা থেকে 'টোমেন' নামে এক ধরণের বিষাক্ত অ্যামিন নির্গত হয়ে থাকে। তা থেকেই ঐ নামের উৎপত্তি। কিন্তু এ ধারণা সঠিক নয়। বিষাক্ত আমিষ খাদ্য পরীক্ষা ক'রে তার মধ্যে ষ্ট্যাফাইলোকক্কাস অ্যাল্‌বা বীজাণু পাওয়া গেছে।

মাথা-গলা চিংড়ি ও মৃত কাঁকড়া এত বিষাক্ত যে, তা মানুষের প্রাণ হানি ঘটাতে পারে। সাধারণ চিংড়ি বা কাঁকড়ার খোলাতেও নানাধরণের বিষাক্ত দ্রব্য থাকে। ভালভাবে পরিষ্কার ক'রে না নিলে ঐ বিষ চিংড়ি বা কাঁকড়ার মাংসের সঙ্গে মিশতে পারে। বিশেষ করে কাদা চিংড়ি, কুঁচো চিংড়ি, মরা ট্যাংরা, গুলে, ন্যাদস প্রভৃতি মাছ নরম হ'লেও খাওয়া উচিত নয়। একথা মনে রাখা দরকার যে, রান্না করলেই আগুনের তাপে সব বীজাণু ধ্বংস হয় না।

বীজাণু-ঘটিত বিষক্রিয়া আরম্ভ হয় খাবার তিন-চার ঘণ্টা থেকে তিন-চার দিনের মধ্যে। সচরাচর দুই থেকে ছয় ঘণ্টার মধ্যে বিষক্রিয়ার উপসর্গগুলি প্রকাশ পেতে থাকে। অল্প বয়সের ছেলে-মেয়েরা তো বটেই বড়োরাও অনেক সময় মারা যায় বীজাণু-ঘটিত বিষক্রিয়ার ফলে।

সতর্ক হ'য়ে না চললে আমাদের সর্ব সময়েই বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে। প্রতিমাসে প্রচুর লোক খাদ্যে বিষক্রিয়ার ফলে মারা যাচ্ছে। 'ভোজনং যত্র তত্র' এবং 'যা পাই তা খাই', এ অভ্যেস কমালে বিপদের আশঙ্কা অনেক পরিমাণে কমে যায়, তা বলাই বাহুল্য।

হাঁপানি

আমাদের বাড়ীর তিনতলায় যিনি থাকেন, তাঁর জন্যে রাত্রে ঘুমোতে পারিনে। সারাদিন পরিশ্রম করার পরে রাত বারোটা একটার সময়, আলো নিভিয়ে বিছানায় শুলাম কি ঘুমের দফা শেষ। আমার ঠিক উপরের ঘর থেকে ভেসে আসে এক মধ্যবয়স্কা মহিলার শ্বাস-কষ্টের কাতরতা। প্রথম প্রথম খুবই অস্বস্তি লাগত। জেগে থেকে ভাবতুম, এই বুঝি শেষ হলো। সে কি ঘরঘর শব্দ! গলির মুখ থেকে পর্যন্ত শোনা যায়। এখন অনেকটা সয়ে গেছে—জানি হাঁপানি রোগে এমনটি হবেই। যখন 'টান' ওঠে, তখন এদের মুখচোখের অবস্থা দেখলে সবারই মায়া লাগে।

হাঁপানি রোগ আমাদের কাছে অপরিচিত নয়। কোলের শিশু থেকে আরম্ভ করে মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধ পর্যন্ত সবাই এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে। আর এ রোগ যে কত যন্ত্রণাদায়ক তা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানে। হাঁপানি রোগে আক্রান্ত রোগীরা স্বভাবতঃই শ্বাসকষ্টে ভোগে। শ্বাসকার্য কথাটার সঙ্গে সঙ্গেই শ্বাসনালীর কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক। কাজেই হাঁপানি রোগ সম্পর্কে বিশদ আলোচনার পূর্বে শ্বাসনালী সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হ'বে না।

কিছু কার্টিলেজ বা নরম হাড় এবং কিছুটা মেমব্রেন দিয়ে শ্বাসনালী তৈরী হয়েছে। এটি দৈর্ঘ্যে দশ থেকে এগার সেন্টিমিটার লম্বা হ'য়ে থাকে। এর অন্য নাম হচ্ছে ট্রেকিয়া। বক্ষপিঞ্জরের মধ্যে এই নলটি দু-ভাগে বিভক্ত হ'য়ে দু-পাশের দুটি ফুসফুসে ঢুকে গেছে। শ্বাসনালীর বিভক্ত দুটি অংশের নাম ব্রঙ্কাস। ডানদিকের ফুসফুসে যে ব্রঙ্কাসটি প্রবেশ করে, তার নাম ডান-ব্রঙ্কাস এবং বাঁদিকের

ফুসফুসে যেটি যায়, তার নাম বাম-ব্রঙ্কাস। ব্রঙ্কাস দুটি ফুসফুসের মধ্যে নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হ'য়ে গেছে। ব্রঙ্কাসের সব চেয়ে ছোট প্রশাখাকে বলা হয় ব্রঙ্কিওল বা ক্লোম শাখা। শেষ ব্রঙ্কিওলটির ব্যাস মাত্র 0·2 মিলিমিটার। এগুলিকে বলা হয় রেস্পিরেটরি ব্রঙ্কিওল। এই ব্রঙ্কিওল ফুসফুসের শ্বাসকার্যের সহায়ক। রেস্পিরেটরি ব্রঙ্কিওল আবার প্রায় এগারো ভাগে বিভক্ত হয়। এদের বলা হয় অ্যালভিওলার ডাক্ট। আমরা নাক দিয়ে যে বাতাস গ্রহণ করি তা শ্বাসনালী ও তার এই সব শাখা-প্রশাখা দিয়ে ক্রমে ক্রমে ফুসফুসে পৌঁছায়।

এবার মূল প্রসঙ্গে আসা যাক। শ্বাস-ত্যাগের সময় যদি কষ্ট হয় তাহলে সেই অবস্থাকেই সাধারণতঃ হাঁপানি বা হাঁপ-ধরা বলা হয়ে থাকে। মস্তিষ্ক থেকে উদ্ভুত ভেগাস নামে একটি স্নায়ু শ্বাসনালী এবং হৃৎপিণ্ড উভয়েই চেতনা সরবরাহ করে। হাঁপানি রোগীদের ভেগাস স্নায়ু কোন কারণে অত্যন্ত উত্তেজিত হ'য়ে কাশির সৃষ্টি করে। ফলে দীর্ঘ সময় কাশবার পর ব্রঙ্কাস থেকে নির্গত লালা মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে। এই কারণে শ্বাস ফেলতে খুব কষ্ট হয়। সঙ্গে সঙ্গে বুক ধড়ফড় করতে থাকে। আঙ্গুলের ডগা অনেক সময় নীলাভ হ'য়ে যায়।

হাঁপানির সময় ব্রঙ্কিওলে অক্সিজেন গ্যাসের খুব স্বল্পতা ঘটে; তাছাড়া ব্রঙ্কিওলের মিউকাস মেমব্রেন ফুলে উঠে বাতাস যাবার পথ প্রায় বন্ধ করে দেয়। এর ফলে অ্যালভিওলগুলিতে খুব কম হাওয়া ঢোকে; এমন কি, অনেক সময় অক্সিজেন প্রবেশ করতেই পারে না। কার্বন-ডাই-অক্সাইডের আধিক্য এবং অক্সিজেনের শ্বল্পতার ফলে রক্তাধারগুলিতে অধিক পরিমাণে কার্বন-ডাই-অক্সাইড থাকে। রক্তে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের আধিক্য হেতু, আকারে, বেটে, হাত-পায়ের আঙ্গুল ও নাকের ডগা নীলাভ হ'য়ে যে'তে পারে। অক্সিজেনের অভাব শ্বাসকেন্দ্রকে সাময়িকভাবে অকেজো করে ফেলে। এর জন্যই

ভীষণ শ্বাসকষ্ট সুরু হয়। শ্বাস গ্রহণ ও শ্বাসত্যাগ উভয় সময়েই কষ্ট অনুভূত হয়। ব্রঙ্কিওলগুলির ধর্ম হচ্ছে প্রশ্বাসের সময় সঙ্কুচিত হওয়া এবং নিঃশ্বাস গ্রহণের সময় প্রসারিত হওয়া, কিন্তু হাঁপানির সময় উভয় ক্রিয়াই বিশেষভাবে ব্যাহত হয়।

শ্বাসকার্যের সহায়ক সমস্ত মাংস পেশীগুলি সঙ্কুচিত থাকার ফলে শ্বাস ত্যাগের সময় খুবই জোর লাগে। সে জন্যেই এ সময় তীব্র শ্বাসকষ্ট অনুভূত হয়। প্রশ্বাসকার্যের সহায়ক মাংসপেশীগুলি বুকের উপর খুব জোর চাপ দেয় এবং পেটের মাংসপেশীগুলিও সঙ্কুচিত হয়ে ফুসফুসের মধ্য থেকে প্রশ্বাস-বায়ু বের করে দিতে সচেষ্ট হয়। ফলে ফুসফুসের মধ্যে অত্যধিক চাপের সৃষ্টি হয়। এই চাপাধিক্যের জন্যে সঙ্কুচিত ব্রঙ্কিওল দিয়ে জোর করে অবরুদ্ধ বায়ু বেরিয়ে যেতে চেষ্টা করে। বেরোবার সময় হিস্‌হিস্ শব্দ হ'য়ে থাকে। সেই শব্দ বাইরে এলে ঘস্‌ঘস্ শব্দের মত শোনায়। জোর করে এই শ্বাসকার্য সংঘটনের ফলে ফুসফুসের স্বাভাবিক সঙ্কোচন প্রসারণ ক্রিয়া ব্যাহত হয়। প্রশ্বাসকার্য স্বাভাবিক ভাবে না হবার জন্যে ফুসফুস এই সময় প্রায় সর্বক্ষণ পূর্ণ প্রসারিত অবস্থায় থাকে।

হাঁপানি রোগ যে খুবই জটিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। কত সামান্য কারণ থেকে হাঁপানি রোগের উৎপত্তি হ'তে পারে তা শুনলে অবাক হ'তে হয়। হাঁপানি রোগকে বংশগত রোগ বলা চলতে পারে, অর্থাৎ বংশপরম্পরায় এই রোগ ছড়িয়ে পড়ে।

সাধারণত পঁচিশ বছর বয়সের আগেই এই রোগের প্রথম আক্রমণ সুরু হয়। স্ত্রীলোকের চেয়ে পুরুষেরা প্রায় দ্বিগুণ সংখ্যায় এই রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে বলে হিসেব পাওয়া গেছে।

বংশানুক্রমে হাঁপানি রোগ আসতে পারে, এ কথা আগেই বলা হয়েছে। বংশে কারো মৃগী বা মূর্চ্ছা রোগ থাকলে, তাদের সন্তান

পরম্পরায় ঐ রোগের প্রসারের সঙ্গে, তাদের মধ্যে হাঁপানি রোগেও দেখা দিতে পারে। বংশে যদি কোন লোক কোন বিশেষ ধরণের আমিষ খাদ্য (যেমন ডিম, মাংস, চিংড়িমাছ ইত্যাদি) খেলেই অসুস্থ হয়ে পড়ে, যাকে চিকিৎসাশাস্ত্রে বলা হয় hyper sensitiveness to certain proteins, তাহলে এই ধারা তার সন্তান-সন্ততিতে ছড়িয়ে পড়ে এবং এ থেকেও হাঁপানি রোগ জন্ম নিতে পারে।

এ সব ছাড়া বাত, সিফিলিস, ফুসফুসের যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগ থাকলেও হাঁপানি রোগ হতে পারে। আবহাওয়া এবং বাসস্থানের উপরও এই রোগের আক্রমণ অনেকাংশে নির্ভর করে। এমন অনেক লোক আছে যারা কেবলমাত্র শুষ্ক আবহাওয়াতে ভাল থাকে। আবার এর বিপরীত-ধর্মী লোকও আছে। এদের যদি পরস্পর বিরোধী স্থানে নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে এরা হাঁপানিতে ভোগে।

নাকের ভিতরের কোন স্থানে যদি জন্মগত অথবা অন্য কোন কারণে বৈকল্য থাকে বা ঘটে, তাহলে তার হাঁপানি রোগ হওয়ার খুবই সম্ভাবনা থাকে। রোগগ্রস্ত টনসিল থেকেও হাঁপানি রোগ হতে পারে।

ইউরোপের ডাঃ ফ্রীম্যান, ডাঃ কোক, ডাঃ ব্রে এবং আমেরিকার ডাঃ ওয়াকার দীর্ঘদিন গবেষণার পর সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, যত হাঁপানি রোগ দেখা যায়, তার মধ্যে শতকরা পঞ্চাশ ভাগই অ্যালার্জির জন্য হ'য়ে থাকে। তাঁরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, মাঠের ধূলা চাল বা গম ঝাড়ানির পর যে ধূলা বেরোয়—সেই ধূলা, ঘাসফুলের রেণু নাকে গেলে অনেকের হাঁপানি সুরু হয়। অনেকে আবার বিশেষ ধরণের ফুল, ঘোড়া, বিড়াল, খরগোস, গিনিপিগ, হরিণ, কুকুর, বানর এমন কি অন্যলোকের মাথার চুল দেখা মাত্রই হাঁপাতে সুরু করে। এমন কি এগুলির নাম শুনলেও কারো কারো হাতে-পায়ে চুলকানি সুরু হ'য়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই শ্বাসকষ্ট অনুভূত হতে থাকে। অনেকের আবার বিশেষ ধরণের ওষুধ (ইপিক্যাকিউনা ইত্যাদি) খেলে হাঁপানি রোগের সূত্রপাত হয়।

দীর্ঘস্থায়ী পেটের গণ্ডগোলের জন্যও হাঁপানি রোগ সৃষ্টি হ'তে পারে। যেসব স্ত্রীলোকের ওভারি অথবা জরায়ুর কোন রোগ আছে, তারা সহজেই হাঁপানিতে আক্রান্ত হয়। যারা আমবাত বা একজিমাতে ভোগে, তাদেরও ঐ হাঁপানি রোগ ধরতে পারে। এ-ছাড়া যারা সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে বা যারা অতিমাত্রায় আবেগপ্রবণ, তারও স্নায়বিক দৌর্বল্যের জন্যে হাঁপানি রোগের কবলে পড়তে পারে। প্রকার-ভেদে হাঁপানিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে ; যেমন—

(1) Bronchial asthma, (2) Cardiac asthma, (3) Renal asthma, (4) Hay asthma (5) Asthmatic dyspnoea for pulmonary tuberculosis, 6) Allergic asthma.

প্রথম প্রকারের হাঁপানি, শীতের সময় হ'য়ে থাকে। শীতের সময় সাধারণত লোকেরা ব্রঙ্কাইটিস রোগে আক্রান্ত হয়। ব্রঙ্কাইটিস থেকে প্রথম প্রকারের হাঁপানি রোগ সৃষ্টি হয়।

দ্বিতীয় প্রকারের হাঁপানির মূল কারণ হৃদরোগ। এ-ধরণের হাঁপানি রাত্রি বেলাতে হয়। অন্য সব রকমের হাঁপানি যে কোন সময়ই হ'তে পারে। এতক্ষণ হাঁপানি রোগের নানা কারণ নিয়ে আলোচনা করা হলো। এবার রোগের উপসর্গ ও চিকিৎসা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হচ্ছে।

হাঁপানি সুরু হ'লে রোগী শ্বাসকষ্টের জন্যে অস্থির হয়ে ওঠে, বিছানায় শু'য়ে থাকতে পারে না। সর্বদাই জানালার কাছে বসে থাকতে চায়। এক একবার বুক চেপে ধরে, কখনও বা গলা টেনে লম্বা করে শ্বাস ফেলতে চেষ্টা করে। চোখে-মুখে ফুটে ওঠে ভীতির চিহ্ন। ঘড় ঘড় শব্দে শ্বাস-প্রশ্বাস চলতে থাকে। রাত্রিবেলা হাঁপানি রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ (রোগের তীব্রতার সময়) বহুদূর থেকেও শোনা যায়। বারে বারে মুখ খুলে, রোগী শ্বাস-প্রশ্বাস সহজ করবার চেষ্টা করে। মুখ পাণ্ডুর এবং ঠোঁট কাল্‌চে হ'য়ে যায়। ক্রমাগত

ঘাম ঝরতে থাকে। এ-রকম অবস্থা বেশ কয়েক ঘন্টা পর্যন্ত চলতে পারে। যদি সে সময়ে উপযুক্ত ওষুধ দিয়ে, রোগের তীব্রতা প্রশমিত না করা হয়, তাহলে সে অবস্থায় রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। লেখক তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখেছেন যে, হাঁপানি রোগীদের মুখে সব সময়ই দুর্ভাবনার চিহ্ন লেগে থাকে, আর তাদের মধ্যে অনেকেরই কাঁধের দু'দিক বেশ সোজা থাকে ও ঘাড় খুব লম্বা হ'য়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

শ্বাসকষ্টের জন্যই এ-রকম হ'য়ে থাকে। এ-রকম দৈহিক গ্লানি থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হাঁপানি রোগীরা প্রায় স্বাভাবিক ভাবে কাজ-কর্ম করে যেতে পারে। বিভিন্ন চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা তাঁদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন যে, অত্যন্ত সঙ্কটজনক অবস্থায় সময়েও হাঁপানি রোগী মারা যায় নি। জীবনীশক্তি নাকি এদের অত্যন্ত বেশী। হয়ত এ ধারণা সর্বক্ষেত্রে ঠিক নয়।

হাঁপানির আক্রমণ যখন খুব তীব্র হয়, তখন অ্যানড্রিন্যালিন ইনজেকসন দিলে সত্বর উপশম হয়। $\frac{1}{4}$ গ্রেন মাত্রার এফিড্রিন হাইড্রোক্লোরাইডের বড়ি বাজারে বিক্রয় হয়। এর এক বড়ি খেলে, খুব অল্প সময়ের মধ্যে হাঁপানির তীব্রতা কমে যায়। এর সঙ্গে এমিনোফাইলিন জাতীয় ওষুধ খেলে বা ইনজেকসন নিলে আরও বেশী উপকার পাওয়া যায়।

যে সব খাবার খেলে হাঁপানির তীব্রতা বৃদ্ধি পায়, রোগীর পক্ষে এরূপ কোন খাদ্য কখনই খাওয়া উচিত নয়। নিয়মিত ভাবে পেট পরিষ্কার রাখা প্রয়োজন। প্রত্যহ কমলা লেবুর রস সেবন হাঁপানি রোগীর পক্ষে বেশ উপকারী। বেশী পরিশ্রমের বা উত্তেজনাপূর্ণ কোন কাজ রোগীর করা উচিত নয়। স্বাস্থ্য ভাল রাখবার দিকে রোগীকে সর্বদাই সচেষ্ট থাকতে হবে। যাদের ধুলা-বালি নাকে গেলে হাঁপানি হয়, তাদের ওসব এড়িয়ে চলা ভাল। মিল বা

ফ্যাক্টরীর কাছে রোগীর বাস করা উচিত নয়। অ্যালার্জি-ঘটিত হাঁপানি রোগে Antistine, Avil, Anthison জাতীয় ওষুধ খাওয়া চলতে পারে।

এসব ছাড়াও হাঁপানি রোগের বহু প্রতিষেধক আছে। যে কোন ধরণের ওষুধ ব্যবহারের পূর্বে সুচিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য। রোগীর অজ্ঞতার ফলে রোগ অনেক ক্ষেত্রেই ক্রমশ বেড়ে চলে। আমাদের দেশে ঝাড়-ফুঁক ইত্যাদি নানা অবৈজ্ঞানিক উপায়ে হাঁপানি সারাবার চেষ্টা হ'য়ে থাকে। এতে রোগ কখনও ভাল হয় না, বরং খারাপের দিকে যায়।

প্রত্যেক মাতা-পিতার উচিত, তাদের কোন সন্তান হাঁপানি রোগে আক্রান্ত হওয়া মাত্র সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করা। সময়মত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হ'লে, রোগ একেবারে সেরে যেতে পারে। নচেৎ ঐ সন্তান থেকে হাঁপানি রোগ বংশানুক্রমে ছড়িয়ে পড়ে, তার অধস্তন সন্তান-সন্ততির জীবন বিষময় করে তুলবে।

হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া

যতগুলি দুরারোগ্য রোগের সন্ধান পাওয়া গেছে, তার মধ্যে হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া অন্যতম। এ রোগ সাধারণ রক্তাল্পতা রোগ নয়। কেন যে এ রোগ মানুষের দেহে বাসা বেঁধে তাকে জীবন মৃত্যুর সীমানায় দোলায়মান করে তোলে, তার কারণ এখন পর্যন্ত জানা যায় নি। 'হিমোলাইটিক' কথাটির মধ্যেই রোগের চেহারা লুকিয়ে আছে। এ রোগে রক্তের লোহিত কণাগুলি ভেঙ্গে যায়। তারই ফলে দেখা দেয় রক্তাল্পতা। দু'টি শ্রেণীতে এই রোগকে ভাগ করা যেতে পারে—(1) অ্যাকিউট (2) ক্রনিক। এখানে অ্যাকিউট (Acute) শ্রেণী নিয়েই আলোচনা করা হবে।

বিগত 1902 সালে ম্যাকিনটস এবং ক্লেল্যাণ্ড এ-রোগের কয়েকটি উপসর্গের কথা জানান। তবে 1925-1930 সালের আগে রোগটিকে ভাল করে চেনা যায়নি। ঐ সময়ে লেডারারই সর্বপ্রথক প্রকাশ করেন যে, এ রোগের আরম্ভ বা সূচনা এবং তার উপসর্গ দেখলে মনে হয়, এর পেছনে রয়েছে কোন কিছুর তীব্র সংক্রমণ। 1940 সালে অ্যাটকিন্‌সন এর কারণ অনুসন্ধানে গবেষণা চালিয়ে যেতে থাকেন। ঐ সালেই ড্যামসেক স্কোয়ার্জ বলেন যে, দেহে কোন রক্ত-তঞ্চকের সন্ধান পেলেন। তবে এখন পর্যন্ত এই রোগের সব শ্রেণীতে এই তঞ্চক বস্তুটি পাওয়া যায় নি। এরোগ মানুষের জীবনকালের প্রথম এবং দ্বিতীয় অধ্যায়েই বেশীরভাগ ক্ষেত্রে আক্রমণ করে থাকে। তবে অন্য বয়সেও যে হ'বে না তার কোন নিশ্চয়তা নেই। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষেই এর কবলে পড়ে।

এ রোগে রক্তে শ্বেতকণিকার পরিমাণ খুব বেশী বেড়ে যায় এবং তার সঙ্গে জ্বরও তীব্র রক্তাল্পতা ও ঈডিমা দেয় এবং আভ্যন্তরীণ যন্ত্র

সমূহে চবির পরিমাণ হ্রাস পে'তে থাকে। যকৃৎ বড় হয় এবং তা 'কনজেস্টেড' হ'য়ে পড়ে। প্লীহাও একই দশা প্রাপ্ত হয়। সাইনাস-গুলি রক্তে অর্গলবদ্ধাস্থার থাকে। রক্ত-তঞ্চন অনিবার্য হ'য়ে ওঠে। অনেক সময় দানবাকৃতির কোষ জন্ম নেয়।

হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়ার প্রথমাবস্থায় যেসব সাধারণ লক্ষণ প্রকাশ পায় তাতে অনেকেই একে অন্য রোগ বলে ভুলে করে বসেন। প্রথমে জ্বর, বমি, আহারে অরুচি, মাথাধরা, পিঠব্যথা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়। কাজেই চিকিৎসকেরাও অনেকে ভুল করে বসেন।

তাঁরা অনেক সময় বলেন এ হলো 'গ্যাসস্ট্রীক ইনফ্লুয়েঞ্জা'। বলা বাহুল্য এ সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক। বিশেষ করে যখন কমবয়সী ছেলেমেয়েদের পেটের অসুখ ও পেট ব্যথা হতে থাকে সে সময়, ঐ উপসর্গগুলি বিশেষ করে চিকিৎসকদের ভ্রম সৃষ্টি করে। জ্বর 100 ফাঃ থেকে 103 ফাঃ পর্যন্ত ওঠে। রক্তদান করা হলে অনেক ক্ষেত্রে নাটকীয়ভাবে জ্বর ছেড়ে যায়, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে জ্বর ছাড়তে পাঁচ থেকে ছয় সপ্তাহ সময় লেগে থাকে। রোগী অনেক ক্ষেত্রেই অচেতন অবস্থায় থাকে (কোমা), সম্পূর্ণ অথবা আংশিক পক্ষাঘাত (প্যারালিসিস ও প্যারেসিস) দেখা দিতে পারে, আভ্যন্তরীণ যন্ত্র সমূহে রক্তক্ষরণ হ'তে থাকে। রক্তাল্পতার জন্য শ্বাসকষ্ট আরম্ভ হয়। রোগী অল্প সময়ের মধ্যে খুব দুর্বল হ'য়ে পড়ে এবং পান্ডু রোগের আবির্ভাব ঘটে। প্রস্রাবে হিমোগ্লোবিন পাওয়া যায়। ক্রমে প্রস্রাবের মাত্রা খুব কমে অনেক সময়ে ইউরেমিয়া রোগ প্রাধান্য লাভ করে। যকৃৎ প্লীহা কিছু বেড়ে হায়।

উপযুক্ত চিকিৎসা না হ'লে মৃত্যুর হার খুব বেড়ে যাবে তা বলা বাহুল্য মাত্র। তবে অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, রোগের আক্রমণের পর কয়েক সপ্তাহ থেকে দু'মাসের মধ্যে, চিকিৎসার অভাবেও রোগ আপনা থেকেই অনেকটা উন্নতির দিকে যেতে পারে। ব্লাড-

ট্রান্সফিউসন হলে রোগ তাড়াতাড়ি ভালোর দিকে যায়। তা না হ'লে অবস্থা বিশেষে প্লীহা কেটে বাদ দিতে পারে।

কার্টিকোট্রোপিন বা কর্টিসোন চালু হবার পর তার ব্যবহারে, বিশেষ সুফল পাওয়া গেছে। রোগের উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত প্রায় এক সপ্তাহ কাল ধরে, প্রতিদিন 300 মিলিগ্র্যাম কর্টিসোন বা কর্টিকো-ট্রোপিন দিয়ে যেতে হয়। প্রেডনিসোন বা প্রেডনিসোলেন ওষুধেও ভাল কাজ হয়। প্রতিদিন 75 মিলিগ্র্যাম এ দু'টি ওষুধ দেওয়া যেতে পারে। বাজারে এই ঔষধদ্বয়ের 5 মিলিগ্র্যাম মাত্রার বড়ি পাওয়া যায়। খুব সঙ্কটকালে এর পনেরটি বড়ি দেওয়া চলতে পারে। এর সঙ্গে চলবে ফোলিক অ্যাসিড বড়ি (5 মিলিগ্র্যাম মাত্রা), দৈনিক তিনটে কি তার বেশি। 'ফেরাস সালফেট বড়ি' দৈনিক তিনটে করে দিতে হবে। যদি দেখা যায় এতে কোন সুফল হচ্ছে না, তখন বাধ্য হয়ে অস্ত্রোপচার চালাতে হয় প্লীহার উপরে। এ ছাড়া রোগীকে বাঁচানোর আর কোন উপায় থাকে না।

পিঠ-ব্যথা

পিঠ-ব্যথা কার হয়নি ? কম-বেশী সবাই পিঠের ব্যথায় ভুগেছেন। হাতুড়ী পিটলে, সর্দিজ্বরে, টাইফয়েড ও কলেরার ইনজেকশন নিলে, বসন্ত হবার আগে, যক্ষ্মারোগে, দেহে ভাইটামিন ও হর্মোনের অভাব ঘটলে—এসব নানা কারণেই আনুষঙ্গিকরূপে পিঠব্যথা হ'তে পারে। আর কোথাও তেমন হয়না, পিঠেই বা কেন হয় ? আমরাতো পিঠ উবু করে হাটি না, বসি না, শুই না, তবে আমাদের পিঠ নিয়ে এত জ্বালা কেন ?

তবে কি যারা দু'পায়ে হাঁটে, তাদের জন্য পিঠ সৃষ্টি হয়নি ? একটু ভেবে দেখলে বোঝা যায় যে, কথাটা মিথ্যা নয়। যারা দু'পায়ে হাঁটে, তাদের পক্ষে পিঠের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী নয়। বোধ হয়, সে জন্যেই মানুষ পিঠের ব্যথায় ভুগে থাকে। যখন আমরা দাঁড়াই, তখন পিঠের মাংসপেশীগুলি সর্বদাই সক্রিয় থেকে পিঠটাকে সোজা করে ধরে রাখে এবং ঘাড়, মাথা ও কাঁধকে তাদের নির্দিষ্ট স্থানে স্বাভাবিক অবস্থায় রাখতে সহায়তা করে বৃদ্ধ পর্যন্ত, সব বয়সের লোকেরা পিঠের ব্যথায় ভুগে থাকে। পিঠ বা কোমরের ব্যথা যে কত কষ্টদায়ক, তা ভুক্তভোগী মাত্রই জানে। পিঠ-ব্যথা হলেই অনেকে মনে করে, যক্ষ্মারোগ হয়েছে। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল ; যেহেতু অনেক কারণেই পিঠের ব্যথা হ'তে পারে। এখানে তারই কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো।

যাদের স্বাস্থ্য ভাল নয়, তারা অতি সাধারণ কাজের পরেই ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে কাজ করলে অথবা ভারী বোঝা বহন করলে তাদের পিঠের মাংসপেশী ক্লান্ত হয়ে পড়ে। ক্লান্ত মাংসপেশী যখন কাজ কর্ম করতে অক্ষম হয়, তখন থেকে পিঠ-ব্যথা সুরু

হয়। পিঠের মাংসপেশী পূর্ণ পুষ্টিলাভ না করলে তাদের দিয়ে স্বাভাবিক ভাবে কাজ করানো যায় না। দুর্বল মাংসপেশী অত্যধিক মাত্রায় চালিত হ'লে, শীঘ্রই অক্ষম হয়ে পড়ে। এর ফলেই পিঠে ব্যথা হ'য়ে থাকে। যারা ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস, গল্‌ফ খেলে বা সাঁতার কাটে, তারা সাধারণত এই রোগে ভোগে না। এর কারণ হচ্ছে, প্রতিনিয়ত ব্যায়াম করবার ফলে, তাদের পিঠের মাংসপেশী সবল ও সুস্থ অবস্থায় থাকে।

অনেক সময় আমাদের হঠাৎ পিঠ-ব্যথা সুরু হয়। হয়ত বাথরুমে গিয়ে জল তুলতে গেছি বা নীচু হয়ে সুটকেশ তুলছি—হঠাৎ আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছিনা। পিঠে ও কোমরে অসহ্য ব্যথা অনুভূত হয়। মনে হয় যেন নিম্নাঙ্গ অবশ হয়ে যাবে। এই অসহ্য মন্ত্রণা কয়েকদিন—এমনকি কয়েক সপ্তাহ অবধি থাকতে পারে। এই অবস্থায় চলাফেরা সব বন্ধ। শুয়ে থাকা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। কিছুদিন পরে যন্ত্রণা কমে গেলেও মাঝে মাঝে, এই রোগের আক্রমণে, রোগী ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে ওঠে। অথচ দেখা যায়, জাহাজ ঘাটার কুলি, যারা প্রত্যহ মণে মণে মাল টানছে, তাদের কিছুই হয়না। কোমরের অস্থি সন্ধিতে কোন রোগ না হলে এই ধরণের ব্যথাকে চিকিৎসাশাস্ত্রে ল্যাম্বেগো বলা হয়।

দেহের বিভিন্ন স্থানের মাংসপেশীর মধ্যে, পিঠের মাংসপেশীই বেশী কাজ করে। তার কারণ হচ্ছে, পিঠের মেরুদণ্ডের বক্রতা সর্বত্র সমান নয়। সেহেতু উবুড় হয়ে কোন কাজ করতে গেলে বা বসতে গেলে, পিঠের মাংসপেশীতে টান পড়ে। খোঁড়া লোক সাধারণত এক পায়ের উপর বেশী জোর দিয়ে হাঁটে। সেজন্য তার মেরুদণ্ড একদিকে বেশী হেলে পড়ে। তা ছাড়া অন্য কোন কারণেও যদি কোমরের উপর অত্যধিক চাপ পড়ে, তাহলেও পিঠ-ব্যথা হবার সম্ভাবনা থাকে। সন্তান-সম্ভবা স্ত্রীলোক অথবা স্ফীতোদর ব্যক্তিদের কোমরে, অত্যধিক চাপ পড়ায় তারা পিঠের ব্যথায় ভুগে থাকে।

আমাদের দেশে অনেক স্ত্রীলোক, প্রৌঢ় বয়সে, পিঠ এবং কোমরের ব্যথায় ভুগে থাকে। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সের পরে, স্ত্রীলোকদের যৌন-জীবনের এক বিশেষ অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে। তখন দেহে হর্মোনের অভাবে এবং অন্যান্য কারণে, মেরুদণ্ডের ক্যালসিয়াম বা চূণজাতীয় পদার্থ ক্ষয়ে গিয়ে, কটিদেশের কশেরুকাগুলির সুচালো দিক মেরুদণ্ডের সারি থেকে একটু বাইরে হেলে পড়ে। এর ফলে, কটিদেশে ও নিতম্বদেশে অত্যধিক যন্ত্রণা হয়। দাঁড়ানো বা চলাফেরার কথা ভাবতেও তারা শিউরে ওঠে। এসব ক্ষেত্রে রোগীকে ক্যাল-সিয়াম বা ভিটামিন-ডি ঘটিত ওষুধ এবং বিশেষ ধরণের হর্মোন দেওয়া হয়। তা ছাড়া বগল থেকে কুঁচকি পর্যন্ত সমস্ত অঙ্গ, শক্ত প্লাস্টারে আবৃত করে রাখা হয়। সচরাচর আমরা যে ধরণের পিঠ-ব্যথার কথা শুনে থাকি, সে সব হয় আরথ্রাইটিস এবং ফাইব্রোসাইটিস রোগের জন্য। আরথ্রাইটিস হচ্ছে অস্থি-সন্ধির রোগ, আর ফাইব্রো-সাইটিস রোগে মেরুদণ্ডের আশেপাশের তন্তু শক্ত হয়ে যায়। দু'টি রোগ প্রায় একই রকমের, তবে আরথাইটিসে অস্থি-সন্ধি ক্রমশই বিকৃত হয়ে পড়ে। কিন্তু ফাইব্রোসাইটিস রোগে অস্থি-সন্ধির বিকৃতাবস্থা আসে না, তবে সারাজীবন ধরে মাঝে মাঝে প্রায়ই কোমর ও পিঠের ব্যথায় ভুগতে হয়।

অনেক সময় যুবকদের বিশেষ জটিল ধরণের আরথ্রাইটিস রোগের আক্রমণ হয়। এই রোগে মেরুদণ্ডের কশেরুকাগুলির মধ্যকার ফাঁকা জায়গা বুজে গিয়ে গোটা মেরুদণ্ডটা একখণ্ড হাড়ে পরিণত হয়। মেরুদণ্ড ধনুকের মত বেঁকে থাকে, তার জন্যে সব সময় অসহ্য যন্ত্রণা হয় এবং রোগী গড়িয়ে ছাড়া চলতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে আবার কশেরুকার মধ্যেকার ছিদ্রপথ, যার মধ্য দিয়ে স্পাইনাল নার্ভ চলে গেছে, সেখানে যদি হাড়ের চূর্ণ জাতীয় পদার্থ ক্রমাগত সঞ্চিত হ'তে থাকে, তাহলে ঐ পথ ক্রমশ বন্ধ হয়ে গিয়ে স্নায়ুতন্তুর উপরে চাপ পড়ে। এর ফলে অসহ্য যন্ত্রণা সুরু হয়।

বিশেষ ধরণের ভাইরাস-ঘটিত রোগে কোমর ও পিঠে যন্ত্রণা হ'য়ে থাকে। Coxsickie নামে এক ধরণের ভাইরাস কর্তৃক আক্রান্ত রোগীর অবস্থা অনেকটা পোলিও রোগে আক্রান্ত রোগীর মত। এই রোগে আক্রান্ত রোগীর পিঠে ও কোমরে এত বেশী যন্ত্রণা হয় যে, তারা বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে না। এই ধরণের রোগের চলিত নাম শয়তানের থাবা বা Devil's grip। বসন্ত রোগাক্রমণের দিন সাতেক আগে থেকেই রোগীর কোমরে এবং পিঠে খুব যন্ত্রণা হ'তে থাকে।

এক ধরণের কোমর-ব্যথার রোগীরা অভিযোগ করে যে, হাঁচি, কাশি বা কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্যে পেটে জোর চাপ দিলে তাদের পিঠের নীচেকার অংশে, একসঙ্গে কতকগুলি পিন ফুটিয়ে দিলে যেমন হয় সেরূপ যন্ত্রণা অনুভূত হ'তে থাকে। এই ধরণের ব্যথার কারণ হচ্ছে, দুই কশেকার মাঝখানে প্লেটের মত যে বস্তুটি আছে, সেটি কোন কারণে ভেঙ্গে গেলে তার ভগ্ন অংশগুলি শিরদাঁড়ার স্নায়ুপথের মধ্যে জমা হয়ে স্বায়ুতন্তুতে ক্রমাগত চাপ দেয়। হাঁচি কাশিতে পেটের মাংসপেশীর উপর চাপ পড়ে এবং তার ফলে স্নায়ুতন্তু পীড়িত হয়।

দেখা গেছে যে, আবেগপ্রবণ লোকেরাই পিঠের ব্যথায় বেশী ভুগে থাকে। বাতিকগ্রস্ত লোকেরা প্রায়ই বলে থাকে যে, তাদের কোমর, পিঠ ও নিতম্বদেশে অসহ্য যন্ত্রণা। এক রোগিণীর ইতিহাসে জানতে পারা যায়, যেদিন সে তার পিতার মৃত্যু সংবাদ শোনে, সেদিন থেকেই তার পিঠে যন্ত্রণা সুরু হয়। আর একজন বলেছে যে, তার সংসারে এক বিশেষ দুর্ঘটনা ঘটবার পর থেকেই তার কোমরে অসহ্য যন্ত্রণা আরম্ভ হয়েছে। আরও একজনের রোগের ইতিহাস থেকে জানা গেছে যে, রেডিওতে অডিশান দেবার সময় অকৃতকার্য হবার পর থেকেই সে পিঠের ব্যথায় ভুগছে। কেন যে এই ধরণের অবস্থা হয়, তার সঠিক কারণ জানা যায় নি।

এতক্ষণ পিঠ–ব্যথার বহুবিধ কারণ নিয়ে আলোচনা করা হলো। এবারে চিকিৎসার কথা সংক্ষেপে কিছু বলা যাক। সাধারণ অবস্থায় অ্যাসপিরিন, নোভালজিন, ইরগাপাইরিন প্রভৃতি বড়ি খাওয়া যেতে পারে। আরথ্রাইটিস হলে কর্টিসোন জাতীয় ওষধ ভাল কাজ করে। নিয়মিত ব্যায়াম ও ম্যাসেজ করা উচিত। তাপ বা ডায়াথার্মি পদ্ধতিতেও চিকিৎসা করা হয়। অনেক সময় অস্ত্রোপচারেরও প্রয়োজন হয়। যে কোন অবস্থাতেই উপযুক্ত চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা কর্তব্য।

গেঁটে-বাত

গেঁটে-বাতের নামটি অতি সুপরিচিত। নামটির মধ্যেই এই রোগের প্রকৃতির বিশেষ পরিচয় মেলে। অস্থির সন্ধিস্থল ফুলে যাবার ফলে অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে এই রোগের আক্রমণ আরম্ভ হয়। ভারতবর্ষের চেয়ে ইংল্যাণ্ড এবং জার্মানী প্রভৃতি দেশে বেশী লোক এই রোগে ভুগে থাকে দেখা গেছে। তাই বলে জাতিবিশেষের মধ্যে এই রোগের আক্রমণ সীমাবদ্ধ, এমন নয়। তবে মোটামুটিভাবে দেখা গেছে যে, উষ্ণমণ্ডলের অধিবাসীদের চেয়ে নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলের আধিবাসীরা এই রোগে বেশী ভুগে থাকে। এই রোগ বংশপরম্পরায়ও চলে আসে। শতকরা আশীভাগ রোগীকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর জানা গেছে যে, তাদের বংশের কেউ না কেউ এর দ্বারা আক্রান্ত হ'য়ে আসছে। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও আছে। সর্বক্ষেত্রেই যে বংশ-পরম্পরায় এই রোগের আক্রমণ ঘটে আসছে, তা নয়, তবে দেখা গেছে পিতা বা মাতার এই রোগ থাকলে তাদের সন্তানেরা সহজেই এই রোগের শিকার হয়। সন্তান-সন্ততিদের দেহে অনেক সময় এই রোগ অস্ফূট অবস্থায় থাকে। রোগের অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হলে অকস্মাৎ রোগী এই রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে।

জীবনের মধ্যবয়সে অর্থাৎ 30 থেকে 50 বছরের মধ্যে সাধারণত লোকেরা এই রোগের কবলে পতিত হয়। তবে তরুণদের যে এই রোগ হতেই পারে না, এমন নয়। দেখা গেছে, যাদের পরিবারে গেঁটে বাতের ইতিহাস আছে, সেই পরিবারের ছেলেরা, কৈশোরেই অনেকে এই রোগে আক্রান্ত হয়েছে। পরিসংখ্যান বলে, স্ত্রীজাতির চেয়ে পুরুষজাতির মধ্যেই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী।

গেঁটে বাতের কারণ সম্বন্ধে জানবার আগ্রহ প্রায় সকলেরই আছে। ইউরিক-অ্যাসিড থেকে উদগত সোডিয়াম বাই-ইউরেট

নামে এক প্রকার লবণ, অস্থি-সন্ধির মধ্যে সঞ্চিত হ'য়ে এই জাতীয় বাত রোগের সৃষ্টি করে। ইউরিক-অ্যাসিড যে এই রোগের অন্যতম প্রধান কারণ তা বহু পরীক্ষার দ্বারা নির্ণীত হ'য়েছে। 1848 সালে, সম্ভবত সর্বপ্রথম এ. বি. গ্যারাড বহু গেঁটেবাতগ্রস্ত লোকের রক্ত পরীক্ষা করে দেখেন যে তাদের রক্তে ইউরিক-অ্যাসিডের পরিমাণ অস্বাভাবিক রকম বেশী। আজ চিকিৎসকেরা এই রোগের চিকিৎসা অতি সহজেই করে থাকেন। কিন্তু গ্যারোডের গবেষণার পূর্বে এই রোগের কোন সঠিক চিকিৎসা সম্ভব ছিল না।

দুই জাতীয় খাদ্যবস্তু থেকে দেহের মধ্যে ইউরিক-অ্যাসিড তৈরী হয়। মাছ, মাংস, কফি, চা, মিষ্টি রুটি, মদ এবং ভাত ইত্যাদি শ্বেতসায় ও প্রোটিন জাতীয় পদার্থ এই অ্যাসিড বেশী পরিমাণে তৈরী করতে সাহায্য করে। সুস্থ লোকের দেহের ভিতর থেকে ইউরিক-অ্যাসিড বের হয় প্রস্রাবের সঙ্গে।

উপরোক্ত জিনিষগুলি মানুষের খাদ্যতালিকা থেকে যদি একেবারে ছাঁটাই করে ফেলা যায় তবে দেহে ইউরিক-অ্যাসিডের পরিমাণ অনেক কমে যাবে। দেখা গেছে যে প্রতি 100 সি. সি. রক্তে 1 থেকে 3 মিলিগ্রাম পর্যন্ত ইউরিক অ্যাসিড থাকে। কোন সুস্থ লোক যার ওজন 10 ষ্টোন 3 পাঃ, তার রক্তে মোট 50 থেকে 150 মিলিগ্র্যাম ইউরিক-অ্যাসিড থাকে। প্রাণীজ-আমিষ জাতীয় খাদ্য একেবারে বর্জন করলে এই আ্যাসিডের পরিমাণ অনেক গুণ হ্রাস পায়।

গেঁটেবাতগ্রস্ত লোকের শরীরে এই অ্যাসিডের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পায়। রোগের আক্রমণ সুরু হবার মুখেই এই অ্যাসিডের পরিমাণ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং সোডিয়াম বাই-ইউরেট লবণে পরিণত হয়ে অস্থিসন্ধির মধ্যে জমান বাঁধে।

সাধারণত কার্টিলেজ হাড়ের উপর উক্ত লবণের একটা কঠিন আবরণ পড়ে। রোগ যখন ক্রমশ জটিলতার মুখে যেতে থাকে তখন এই লবণের স্তর রোগীর হাড়গুলোকে ক্ষয় করে লবণে পরিণত করে।

ক্রমে ক্রমে এই লবণের স্তর লিগামেন্ট, টেণ্ডন ইত্যাদি ভেদ করে রোগীকে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

বাই-ইউরেট লবণ, কার্টিলেজ হাড় এবং কিড্নীর মধ্যে জমা হয়ে ইউরেমিয়া নামে কিড্নীর এক দুরারোগ্য ব্যাধির সৃষ্টি করে। গেঁটে বাতের রকমফের সম্বন্ধে কিঞ্চিত আলোচনা করলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে বলে মনে করি। এই বাতরোগ তিন রকমের আছে। 1নং অ্যাকিউট গাউট ; 2নং ক্রনিক গাউট এবং 3নং ইররেগুলার গাউট। প্রথমে অ্যাকিউট গাউটের আলোচনায় আসা যাক। রাতের নিস্তব্ধ অন্ধকারে এই রোগ তার তীক্ষ্ণ থাবা বিস্তার করে থাকে। রোগীকে ঘায়েল করবার জন্য প্রথম আক্রমণই তার হিংস্র হয়ে ওঠে। এই অকস্মাৎ আক্রমণের পূর্বে রোগী তার শরীরের অস্বস্তিভাব টের পায় —যেমন অজীর্ণতা, হাতে পায়ে ব্যথা, ইত্যাদি উপসর্গ, রোগীকে আগে থেকেই দুর্বল করে আনে। গভীর সুষুপ্তির মাঝে হঠাৎ রোগী যন্ত্রণায় ককিয়ে ওঠে। প্রথম যন্ত্রণা আরম্ভ হয় পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের তলা থেকে। অসহ্য যন্ত্রণায় আঙ্গুলটি কাঁপতে কাঁপতে শক্ত হ'য়ে যায়। দেহের তাপও বেড়ে যায় 101 ফাঃ থেকে 102 ফাঃ পর্যন্ত। অল্প সময়ের মধ্যে রোগী ঘামতে আরম্ভ করে এবং অবশেষে নিদ্রার কোলে আশ্রয় গ্রহণ করে। পরদিন সকালেই দেখতে পাওয়া যায় রোগের প্রচণ্ড আক্রমণের এক বীভৎস ছবি। আঙ্গুল ফুলে গেছে, চামড়া লাল হ'য়ে চক্চকে হয়েছে, আর সারা শরীরে, বিশেষ করে গাঁটে গাঁটে কি অসহ্য যন্ত্রণা। যেন কোন দৈত্য সারা রাত ধরে বেদম প্রহার করেছে। দিনের বেলা যন্ত্রণার কিছু উপশম ঘটে বটে, কিন্তু পৃথিবীতে অন্ধকার নেমে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই যন্ত্রণার তীব্রতা অসম্ভব বেড়ে যায়। কখনও কখনও শ্বাসকষ্ট, বিকার, মূর্চ্ছা প্রভৃতি উপসর্গও দেখা দিয়ে থাকে। এই রোগের স্থিতিকাল দুদিনও হ'তে পারে আবার এর জের কয়েক দিনও চলতে পারে। রোগ যখন সারবার মুখে আসে তখন যন্ত্রণা কমে গেলেও ফোলা সহজে যায় না।

এই রোগের সঙ্গে যদি পেটের গোলমাল দেখা দেয় তবে রোগীর অবস্থা মারাত্মক হ'য়ে পড়ে। শরৎ এবং বসন্তকালে এই শ্রেণীর রোগ তার অভিযান সুরু করে।

2। দ্বিতীয় শ্রেণীর রোগ—ক্রনিক গাউট। ক্রনিক কথায়ই বুঝতে হবে যে, রোগ দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। এই আক্রমণের পরে যদি উপযুক্ত চিকিৎসা করানো না হয় তবে অস্থি-সন্ধির মধ্যে তা বাসা বেঁধে থাকে। লিগামেন্ট ক্যাপসুল, কার্টিলেজ এবং হাড়ে সোডিয়াম বাই-ইউরেট লবণ জমা হ'য়ে হ'য়ে সেই জায়গাটাকে স্ফীত করে দেয়। স্ফীত জায়গাটাকে অনেকটা তোবড়ানো অ্যালুমিনিয়াম পাত্রের মতো বিসদৃশ দেখায়। রোগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লবণের স্তরের উপরকার চামড়া ফেটে গিয়ে সাদা সাদা চূণের গুঁড়োর মতো লবণ বেরিয়ে আসে। পরে ঐ সব জায়গায় ঘা হয়ে যায় এবং ঐ ঘা সারানো খুব শক্ত হয়। রোগীর হজমের গোলমাল হয় এবং উচ্চ রক্তচাপ ও ধমনীর নানারূপ অসুখে রোগী ভুগে থাকে।

3) ইররেগুলার গাউট—এই শ্রেণীর রোগ কোন নিয়ম শৃঙ্খলার ধার ধারে না। হঠাৎ এর আক্রমণ ঘটে, আবার কিছুদিন এর উপস্থিতি টেরই পাওয়া যায় না। আগেকার দিনে বাতরোগের কোন সঠিক সংজ্ঞা ছিল না বলে অজীর্ণতা, একজিমা, মাথাধরা, স্নায়বিক দৌর্বল্য, হৃদ্‌পিণ্ডের অসুস্থতা ইত্যাদি উপসর্গকে বাতরোগ বলে মনে করা হতো। এই রোগে দীর্ঘদিন ভুগলে দেহের অনেক ক্ষতি হয়। বিশেষ করে এই রোগে নানা ধরণের চক্ষুরোগের সৃষ্টি হয়। যেমন গ্লুকোমা বলে এক প্রকার চক্ষুরোগে; এই রোগীর চিরতরে দৃষ্টিশক্তি লোপ পেতে পারে। এই ধরণের রোগীর প্রস্রাবে অনেক সময় পাথর পাওয়া যায়।

এতক্ষণ গেঁটেবাত রোগের প্রকৃতির বিশেষ বিশেষ দিক নিয়ে কিছু আলোচনা করা গেল। কিন্তু রোগ হলে তার প্রতিকারও হওয়া

5

দরকার বৈকি। তাই এবার এই রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন বোধ করছি।

চিকিৎসার প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে রাখা দরকার যাতে দেহের মধ্যে ইউরিক অ্যাসিডের পরিমাণ বৃদ্ধি না পায়, তার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। সেই কারণে প্রাণীজ-আমিষ খাদ্য যতদূর সম্ভব কম খাওয়া দরকার। রোগী পরিমিত এবং সুনির্দিষ্ট খাবার গ্রহণ করবে। কালোজাম বা ঐ জাতীয় ফল যাতে ইউরিক-অ্যাসিড উৎপন্ন হয়, তা খাওয়া একেবারে নিষেধ। কারণ ঐ সব ফলের মধ্যে অক্সালেট লবণ খুব বেশী পরিমাণে থাকায় কিড্‌নীর পক্ষে খুব ক্ষতিকারক হয়।

রোগী যদি মদ অথবা ঐ জাতীয় কোন দ্রব্যে অভ্যস্থ থাকে তবে তাকে ঐ দ্রব্য অচিরাৎ বিষবৎ পরিত্যাগ করতে হবে। ঝর্ণার জল, পাহাড়ে এলাকার কূপের জল, অর্থাৎ যার মধ্যে খনিজ পদার্থ মিশ্রিত আছে, সেই সব জল বাতের রোগীর পক্ষে খুব উপকারী। ভুবনেশ্বর এবং সীতাকুণ্ডে উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। এই উষ্ণ প্রস্রবণে স্নান করলে রোগী বেশ উপকার পেতে পারে।

প্রতিকার সম্বন্ধে এতক্ষণ যে আলোচনা করা হলো তা কতকটা এই রোগের প্রতিষেধক হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এবারে তীব্র যন্ত্রণার সময়ে সাময়িক উপশমের নিমিত্ত কিছু ওষুধের ব্যবস্থার কথা বলছি। যন্ত্রণা অসহ্য হলে, Lotio plumbi C Opio নামে এক জাতীয় তরল ওষুধে তুলা ভিজিয়ে, গাঁটের উপর চেপে বেঁধে দিলে ব্যথার কিছু উপশম হয়। তা ছাড়া সে সময় যন্ত্রণাযুক্ত হাত বা পা উঁচু বালিশের উপর রাখলে বেশ উপকার পাওয়া যায়। পায়খানা এবং প্রস্রাব নিয়মিত পরিষ্কার হওয়া দরকার। সেইজন্য মাঝে মাঝে ক্যালোমেল জোলাপ নিলে ভাল হয় এবং তার সঙ্গে কলসিচিনের বড়ি খেলেও ভাল ফল পাওয়া যায়। এতে গাঁটের ফুলো কমে যায়। যন্ত্রণা কমাবার জন্য Sodium salicylate এবং অন্যান্য ক্ষারজাতীয় ওষুধের মিক্সচার তৈরী করে রোগীকে খেতে দেওয়া যেতে পারে। এগুলি

অত্যন্ত সাধারণ চিকিৎসার কথা। এ ছাড়া আরও বহু প্রকারের চিকিৎসার আছে। বৈদ্যুতিক চিকিৎসা-পদ্ধতিও এই রোগে বিশেষ ফলপ্রদ।

যা হোক, আমাদের একটা জাতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, রোগ একেবারে ঘোরালো না হ'লে আমরা চিকিৎসকের দ্বারস্থ হই না। যদি রোগের সূচনাতেই সুচিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া যায় তবে অতি সহজেই রোগমুক্তি ঘটে। প্রত্যেক রোগীর মনে রাখা দরকার যে সমাজের উপরে তার গুরু কর্তব্য আছে। সুস্থ সবল সন্তান সমাজের ও দেশের ভিত গড়ে তুলবে। রোগকে প্রথম থেকে অবহেলা করে পঙ্গু অথর্ব বংশধর উপহার দিয়ে যেন কোন ব্যক্তি সমাজের অভিশাপগ্রস্ত না হন, সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

যক্ষ্মারোগ

এক সময়ে এ রোগকে ইঙ্গিতে বলা হতো 'রাজরোগ'। তবে দেখা গেছে এই রোগ অধিকংশ ক্ষেত্রেই প্রজাদের আক্রমণ করে থাকে। অধীনতার গ্রাসে আচ্ছন্ন ভারতবর্ষে এ রোগ সারাতে সর্বস্ব খোয়াতে হতো। কিন্তু তাহলেও কি রোগ সারতো! সবাই জানতো 'হাড্ডিসার' অবস্থায় মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে রোগী। চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল—উত্তম আহার, শৈলাবাসে দিন যাপন এবং তার সঙ্গে বলকারী ওষুধ সেবন। কিন্তু রোগের প্রকৃত চিকিৎসা বলতে যা বোঝায়, তা হতো-ই না। অবশ্য অনেক আগে তা জানাও ছিল না। এখন যক্ষ্মা হলেই যে মরতে হবে এ ভয় নেই। প্রথম দিকে রোগ ধরা পড়লে রোগমুক্তি ষোল আনা নিশ্চিত।

আমাদের দেশে এ-রোগীর সংখ্যা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। ভারতের সহর ও গ্রামে প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ এই মারাত্মক রোগের কবলগ্রস্ত হচ্ছে। বাংলাদেশে শতকরা সত্তর-আশীভাগ লোক পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে ভোগে বলে রিপোর্টে জানা গেছে। অনাহার, স্বল্পাহার এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, থাকতে বাধ্য হচ্ছে আর সেই সুযোগে তাদের দুটো ফুসফুসের মধ্যে নিশ্চিত আশ্রয় লাভ করছে লক্ষ লক্ষ যক্ষ্মাবীজাণু।

আলো-হাওয়াবিহীন ঘরে যক্ষ্মার বীজাণু দ্রুতগতিতে বংশ বৃদ্ধি করে। এর উপরে আছে জীবনে হতাশা। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই এই রোগের কবলগ্রস্ত হতে পারে। পাঁচ থেকে পনের বছরের ছেলেমেয়েরা বেশী সংখ্যায় আক্রান্ত হয়। যারা গ্রাম থেকে হঠাৎ শহরে এসে বসবাস আরম্ভ করে তাদের অনেকেরই এই রোগের প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে ওঠেনি। ফলে তারা সহজেই যক্ষ্মারোগে

আক্রান্ত হতে পারে। খনি বা ঐ জাতীয় প্রতিষ্ঠানে অর্থাৎ যেখানে প্রচুর ধূলো বালি আছে এবং ঐরূপ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বহুলোক একখানে জড় হয়ে বাস করে, সেখানে কর্মীরা সহজেই এই রোগে আক্রান্ত হয়।

অপর কয়েকটি বিশেষ ধরণের রোগও লোককে যক্ষ্মা রোগের দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে পারে। যথা, হাম, ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া, হুপিং-কাশি, ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিউমোকোনিওসিস, অ্যালকোহলিজম, বহুমূত্র, সিফিলিস, জন্মগত হৃদরোগ, উন্মাদ রোগ ইত্যাদি।

1882 সালে ডাঃ কক্ (Koch) সর্বপ্রথম জানালেন যে, যক্ষ্মারোগ কোন বিশেষ বীজাণুর আক্রমণে সৃষ্টি হয়। এই বীজাণুর নাম মাইকোব্যাক্টিরিয়াম টিউবারকিউলোসিস। এই বীজাণুকে প্রধানত চার শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—

(1) Human rype
(2) Bovine type
(3) Avian ,,
(4) Reptilian ,,

প্রথম দুটি শ্রেণী মানুষের দেহে রোগের সৃষ্টি করে। সম্ভবত তৃতীয়টিও। ফুসফুসের যক্ষ্মারোগে প্রথম শ্রেণীর বীজাণু থাকে শতকরা 97 ভাগ। টনসিল বা অন্যান্য গ্রন্থির যক্ষ্মারোগে শতকরা 80 ভাগ বর্তমান থাকে বোভাইন ধরণের বীজাণু। এখন কথা হ'ল দেহের মধ্যে এসব বীজাণু যায় কোন পথ দিয়ে? সাধারণত প্রশ্বাসের সঙ্গে, টন্‌সিল, খাদ্যনালী এবং লোমকূপ দিয়ে এরা প্রবেশ করে মানবদেহে।

শ্রেণী হিসাবে যক্ষ্মা রোগকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়।

(1) Acute Miliary Tuberculosis
(2) Chronic-Miliary Tuberculosis
(3) Acute-Caseous ,,

(4) Fibro-Caseous ,,
(5) Fibroid ,,

রোগাক্রমণের ফলে ট্রেকিও-ব্রঙ্কিয়াল গ্ল্যাণ্ডগুলি (Tracheo-broncheal gland) আকারে বড় হতে থাকে এবং শক্ত হয়ে যায়। ফুসফুসের উপরের পর্দা বা প্লুরা (pleura) ক্রমে আক্রান্ত হয়। যক্ষা রোগের প্রারম্ভে শুকনো প্লুরিসি রোগ আসতে পারে। এ ছাড়া টিউবার কিউলাস—মেনিনজাইটিস, পেরিটোনাইটিস, এন্টেরাইটিস, জেনিটো-ইউরিনারি টিউবারকিউলোসিস, হাড়ের যক্ষা ইত্যাদি রোগ বাড়তি উপসর্গরূপে আসা অস্বাভাবিক নয়।

রোগের সূচনাতে জ্বর-জ্বর ভাব, রক্তাল্পতা, অ্যামেনোরিয়া (ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়া), বুক ধরফড়ানি, ক্রমান্বয়ে ওজন কমা, সন্ধ্যার দিকে অল্প জ্বর ওঠা, কাশি ইত্যাদি হয়। গলার স্বর পরিবর্তিত হয়। স্বর ঘড়ঘড়ে হয়ে যায়। প্রায়ই সর্দি হতে থাকে। দুর্বলতা বাড়ে। কাশি সহজে যেতে চায় না। ক্ষুধামান্দ্য দেখা দেয়। পেট সবসময় ফুলে থাকে। আর সেই সঙ্গে ওজন কমতে থাকে।

অসুখ এগিয়ে গেলে রক্তবমি হয়। তবে সব ক্ষেত্রে যে রক্তবমি হবেই এমন কোন কথা নেই। রক্ত পড়ে নি, অথচ ফুসফুসের মধ্যে গর্ত হয়ে গেছে এমন অনেক ক্ষেত্রই দেখা যায়। অল্পবয়স্কদের রোগের প্রারম্ভে নিউমোনিয়া হতে পারে। খুস্‌খুসে কাশি অনেকদিন ধরে চললেই সচেতন হওয়া প্রয়োজন। যে দিকের ফুস্‌ফুস রোগাক্রান্ত হয় সে দিক ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ায় শ্বাসকার্যে বিঘ্ন ঘটে।

আরো একটি উপসর্গ আছে—তা হলো সায়ানোসিস। এতে হাত-পা বা মুখের পাতলা চামড়া নীল্‌চে হয়ে যায়। আঙুলের ডগা, চোখের কোণ এবং ঠোঁটের আশেপাশের নীল ছোপ দেখা যায়।

টি. বি. রোগ হলেই যে, সব ক্ষেত্রে যন্ত্রণা হবে এমন কোন কথা নেই। সাধারণত প্লুরিসি হলে বুকে ব্যথা হয়। যক্ষারোগাক্রান্ত লোক সকলেই রাত্রে খুব ঘামে। ঘুম থেকে ওঠার পর সকাল

7-8 টার সময় তাপমাত্রা 97° বা 90° ফাঃ থাকে। সন্ধ্যের দিকে বাড়ে।

একিউট-মিলিয়ারি টিউবারকিউলোসিসে জ্বর সব দিন যে হবেই এমন কোন কথা নেই। যখন দেখা যাবে যে, সকালের তাপমাত্রা সন্ধ্যার চেয়ে বেশী, তখন বুঝতে হবে যে, রোগ জটিল অবস্থায় পেঁাছেছে।

একিউট-কেসিয়াস টিউবারকিউলোসিসে প্রথম দিকে দৈহিক তাপ বেশী থাকে। নিউমোনিয়ার সঙ্গে এর কিছু সাদৃশ্য থাকে। তাপমাত্রা ক্রমে কমে আসে।

ক্রনিক ফাইব্রো-কেসিয়াস টিউবারকিউলোসিস রোগে তাপমাত্রার কোন নির্দিষ্টতা নেই। কয়েকদিন বাদে বাদে উত্তাপ হঠাৎ বেড়ে যায়।

ফাইব্রয়েড টিউবারকিউলোসিস রোগে জ্বর প্রায় হয় না বললেই চলে। তবে যেদিন খুব বেশী পরিশ্রম করা হয়, সেদিন তাপমাত্রা কিছু বাড়ে।

শিশু এবং কমবয়সী ছেলেরা এই রোগে আক্রান্ত হলে সহজে করাই বাঞ্ছনীয়।

এই রোগের প্রতিষেধক হিসাবে প্রতিটি লোকের উচিত উপযুক্ত পরীক্ষার পর বি. সি. জি. টীকা নেওয়া।

রোগের প্রথম অবস্থায় স্যানাটোরিয়ামে চিকিৎসা ফলপ্রদ। রোগীকে প্রত্যহ 3000 থেকে 3500 ক্যালরি মানের খাদ্য দেওয়া উচিত। মাছ, মাংস, ডিম, চর্বিজাতীয় খাদ্য, দুধ প্রচুর পরিমাণে খেতে দেওয়া দরকার।

থুথু ফেলার জন্য পিকদানী ব্যবহার করা প্রয়োজন। ধূমপান একেবারেই চলবে না। জলবায়ু পরিবর্তন করা প্রয়োজন। যে সব জায়গা শুকনো এবং ঠাণ্ডা আবহাওয়াবিশিষ্ট, সে সব স্থান বাস করবার জন্যে নির্বাচন করা উচিত।

বিশ্রাম একান্তভাবে প্রয়োজন, তবে সারা দিনে রোগীর লঘু শ্রমসাধ্য কিছু কিছু কাজ করা উচিত। তিনটি ওষুধ অপরিহার্য। সেগুলি হলো—

(1) স্ট্রেপটোমাইসিন সালফেট ইনজেকশন

(2) প্যারা-অ্যামিনো স্যালিসালিক অ্যাসিড বা P. A. S.

(3) আইসোনিয়াজিড

এছাড়া প্রয়োজন ভাইটামিন বি-কমপ্লেক্স। লিম্ফগ্ল্যাণ্ডের টি. বি. রোগে প্রেডনিসোলোন (অন্যান্য ওষুধের সঙ্গে) ব্যবহার করে সুফল পাওয়া গেছে।

রাত্রিবেলায় ঘাম বন্ধ করবার প্রধান উপায় আলো-হাওয়া যুক্ত ঘরে এবং হাল্কা পোষাকে রোগীকে রাখা। কয়েকদিন পূর্ণ বিশ্রাম নিলে জ্বর কমে আসবে। অজীর্ণতার জন্যে উপযুক্ত ওষুধ দিতে হয়।

বর্তমানকালে এ রোগের চিকিৎসার বিশেষ অগ্রগতি হয়েছে। তার ফলে যক্ষ্মা এখন চিকিৎসকের আয়ত্তের মধ্যে এসেছে বললেই চলে। প্রথম অবস্থাতে উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা হলে সম্পূর্ণভাবে নিরাময় হবার সম্ভাবনা ষোল আনা, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বসন্ত

বসন্ত রোগের আক্রমণ বসন্ত কালেই। রবীন্দ্রনাথের 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতার সেই চরণটি মনে পড়ে—'কোথা হা হন্ত, চির বসন্ত, আমি বসন্তে মরি'। শীত ও বসন্তের সন্ধিকাল থেকে সুরু ক'রে চৈত্র-বৈশাখ পর্যন্ত বসন্তরোগ তার আক্রমণ চালায়। গরম দেশে এর তাণ্ডবনৃত্য ভালভাবে লক্ষ করা যায়। একবার সুরু হ'লেই মহামারী। এখানে 'আসল বসন্তের' কথাই বলছি।

রোগ সুরু হয় জ্বর সঙ্গে নিয়ে। অনেক সময়েই মৃত্যু এসে সব জ্বালা জুড়িয়ে দেয়। যদি তা নাও ঘটে, তাহলেও রোগ তার চিহ্ন রেখে যায় রোগীর সর্বাঙ্গে। বিশেষ করে মুখে, হাতে যে ক্ষতচিহ্ন থাকে তা আর চলে যায় না।

বসন্তরোগ আধিদৈবিক নয়, যদিও দুর্ভাগ্যবশত অনেকে এখনও এই রোগের কারণকে কোন দেবীর অভিসম্পাত বলেই মনে করে থাকে। এ রোগের মূল কারণ অতি সূক্ষ্ম একজাতীয় বীজাণুর (ভাইরাস) আক্রমণ ছাড়া আর কিছু নয়। রোগ জেঁকে বসার আগে রোগীর দেহে দেখা দেয় নানা উপসর্গ। জ্বর, গা-হাত-পা ব্যথা ইত্যাদি। রোগের সংক্রমণকাল সাধারণত বারো থেকে একুশ দিন পর্যন্ত। জ্বর খুব বেশী থাকে। প্রথম চার বা পাঁচদিনের মধ্যে গায়ে দেখা দেয় গুটি।

এককালে এ রোগ কেবলমাত্র এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন দেশে সীমাবদ্ধ ছিল। ক্রমে তা অন্যান্য মহাদেশেও ছড়িয়ে পড়ে। নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলে শীত ও বসন্তকালে আরম্ভ হয় এ-রোগ। এর তীব্রতা হ্রাস পেতে থাকে গ্রীষ্মের প্রখরতার সঙ্গে সঙ্গে। তবে তখনও একেবারে লোপ পায় না। বর্ষা সমাগমের সঙ্গেই রুদ্ধ হয়ে যায়

এ রোগের অগ্রগতি। কিন্তু তাও সঠিক ভাবে বলা যায় না। যেহেতু অন্যান্য সময়েও বসন্ত রোগের আক্রমণের কথা শোনা যায়।

বসন্ত রোগের ভাইরাস মানুষের দেহে প্রবেশ করে দু'টি পথে। বসন্ত রোগে আক্রান্ত কোন রোগীর খুব কাছে থাকলে অথবা রোগীর ব্যবহৃত কোন দ্রব্য ব্যবহার করলে বসন্তের ভাইরাস নাসাপথ ও লোমকূপ দিয়ে শরীরের মধ্যে ঢুকে যায়। এমনকি রোগীর জামা-কাপড় যেখানে শুকোতে দেওয়া হয় সেখানে দাঁড়ালেও ভাইরাস দিব্যি সুস্থ মানুষের মধ্যে গিয়ে রোগ সৃষ্টি করতে পারে। তাই দেখা যায় শহরের মধ্যে কোথাও বসন্ত রোগীদের হাসপাতাল থাকলে তার চারপাশের গৃহস্থ বাড়ীতে এই রোগের আক্রমণ হতে পারে। একারণেই সংক্রামক রোগের হাসপাতাল সাধারণত শহরের বাইরের দিকে করা হয় এবং তার আশে পাশে অনেকটা ফাঁকা জায়গা থাকে। বসন্তের ভাইরাস এক মাইলের মধ্যে বাতাসে সর্বত্র ছড়িয়ে থাকতে পারে (হাসপাতাল থেকে)। এ ছাড়া মাছি, গৃহপালিত পশুর সাহায্যেও এ রোগ অন্যত্র পরিবাহিত হতে পারে।

রোগের বীজাণু এপিডার্মিসের নীচে ত্বকের গভীর প্রদেশে বাসা বেঁধে থাকে। তারপরে গুটি বেরোয় ধীরে ধীরে। রোগের আক্রমণ হঠাৎ হয়ে থাকে। শীত করে জ্বর আসে, মাথায়, কোমরে অসম্ভব ব্যথা হয়। জ্বর ওঠে 103° থেকে 104° পর্যন্ত। শিশুরা বমি করতে থাকে। জ্বরের ঘোরে অনেকে ভুল বকতে থাকে।

দুরকমের গুটি দেখা যায়—একধরণের রং গাঢ় লোহিত। এগুলি প্রথমে বগলে, কোমর ও হাঁটুতে দেখা যায়। পরে হাত ও পায়ের তালুতে প্রকাশ পায়। দ্বিতীয় ধরণের গুটির রং ধূসর গোলাপী। এরা ইতস্তত ভাবে ছড়িয়ে থাকে কোমর, বগল, পেট, ঘাড়, পায়ের নানাস্থানে। প্রথম দিনের পর থেকেই মুখ ও হাতের গুটিগুলি কতকটা শক্ত ধরণের হয়। তখনও তার মধ্যে জলীয় পদার্থ আসে না।

তৃতীয় দিনে গুটিগুলি ফুলতে থাকে। চতুর্থ বা পঞ্চম দিনে প্রায় সবগুলি গুটি ফুলে ওঠে। জ্বর নেমে যায় কিন্তু সর্বাঙ্গ ফুলে যায়। নয়-দশ দিন পরে এগুলি ফাটতে থাকে এবং বাদামী বা কালো রঙের খোসায় ভরে যায় সর্বদেহ।

গলা ও মুখের ভিতরে, এমনকি শ্বাসনালীতেও গুটি বেরোতে পারে। তখন কথা বলা বা খাওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে পড়ে। নাড়ীর গতি বেড়ে যায়। শ্বাস-প্রশ্বাসও বেশ দ্রুতবেগে চলে। রোগ জটিল ধরণের হ'লে নাড়ী হ'য়ে পড়ে ক্ষীণ, কিন্তু তার গতি থাকে দ্রুত এবং তা অনিয়মিত ভাবে চলে। অনেক সময় দেহের তাপ স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক নীচে নেমে গিয়ে মৃত্যু ঘটাতে পারে।

রোগ আক্রমণে শেষের দিকে গুটিগুলি বেশ ভোগায়। বগল ও ঘাড়ের লিম্ফ গ্রন্থিগুলি বেশ বড় হয়। পেশীর মধ্যে ফোড়া হতে পারে। সবচেয়ে দুশ্চিন্তার কারণ চোখ। চোখের পাতা ফুলে ওঠে। কেরাটাইটিস, কর্নিয়াতে ঘা, প্যানো-অপথ্যালমাইটিস প্রভৃতি চক্ষুরোগের সৃষ্টি হয়। রেটিনার মধ্যে রক্তক্ষরণ হতে পারে এবং তাহলে চোখ অন্ধ হয়ে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক।

কলকাতায় যে সব অন্ধ বিদ্যানিকেতন আছে, সেখানে খোঁজ নিয়ে দেখেছি তাদের অধিকাংশই বসন্ত রোগের কবলগ্রস্ত হ'য়ে হারিয়েছে চোখের দৃষ্টি চিরতরে। ব্রঙ্কাইটিস, ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া, প্লুরিসি প্রভৃতি রোগও একই সঙ্গে আক্রমণ করে রোগীর অবস্থা সঙ্কট-জনক ক'রে তুলতে পারে। অনেক সময় আবার অস্টিওমায়েলাইটিস, আরথ্রাইটিস, নেফ্রাইটিস প্রভৃতি রোগ বাড়তি উপসর্গ হিসাবে আসতে পারে।

রোগের হাত থেকে কোন মতে রেহাই পেলেও চোখ, কান ইত্যাদির কর্মশক্তি চিরতরে লোপ পেলে সমস্ত জীবন বিষময় হয়ে ওঠে। বসন্ত রোগে মৃত্যুর হার—শতকরা পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ।

এবারে চিকিৎসার কথা কিছু আলোচনা করা যাক। প্রতি বছর বসন্তের প্রতিষেধক হিসাবে টীকা নেওয়া একান্ত কর্তব্য। রোগীর ঘর এবং বস্ত্রাদি ভালভাবে নির্বীজন করতে হবে। রোগীকে সম্পূর্ণ আলাদা ঘরে রাখতে হবে। ঘরে হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থা রাখতে পারলে ভাল হয়। বিছানা যত হাল্কা হয় ততই ভাল।

রোগীর কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা প্রয়োজন। দিনে-রাত্রে বেশ কয়েকবার ঠাণ্ডা ও গরম জল দিয়ে গা মুছিয়ে দেওয়া দরকার। প্রতিদিন মুখ পরিষ্কার করিয়ে দিতে হ'বে, পিঠের যন্ত্রণা উপশমের জন্যে কখনো কখনো আইস-ব্যাগ ব্যবহার করা চলতে পারে। তা ছাড়া অ্যাসপিরিন, ফেনাসেটিন, ব্রোমাইড দেওয়া চলতে পারে। বমির উপসর্গ দূর করবার জন্য আইসক্রীম, দুধ (বরফ-ঠাণ্ডা) দিলে ভাল হয়। পাঁচ ফোঁটা Liq Iodi Mitis খেতে দিলেও ভাল ফল পাওয়া যায়। রোগীর চোখে বোরিক অ্যাসিডের (Boric Acid) জল দিয়ে বারে বারে ধুইয়ে দেওয়া দরকার। চিকিৎসকের মতানুসারে মার্কারি অয়েণ্টমেণ্ট, অ্যাট্রপিন অয়েণ্টমেণ্ট ব্যবহার করা চলতে পারে। (বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা সম্প্রতি দাবী করেছে যে বিশ্ব থেকে আসল বসন্ত নিমল হয়েছে।)

ডিপথিরিয়া

প্রতিদিন খবরের কাগজ খুললেই আজকাল 'ডিপথিরিয়া' রোগের সংবাদ পাওয়া যায়। শিশুদের প্রধান রোগ ত বটেই, বয়স্করা যে এর আক্রমণ থেকে সম্পূর্ণ রেহাই পায়, তা নয়। শরৎ এবং শীতকালে এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি হলেও প্রতি ঋতুতেই আজকাল এ রোগ হচ্ছে। এক থেকে পনের বছর বয়সের ছেলেমেয়েরা এ রোগের প্রধান লক্ষ্যস্থল।

যে বীজাণু দ্বারা এ রোগের সৃষ্টি তার নাম Coryne-bacterium diptheriae (B. diptheriae বা klebs-Loeffer bacillus)। এর সংক্রমণ কাল 2 থেকে 10 দিন। সাধারণত সংক্রমণের 3 থেকে 4 দিনের মধ্যেই রোগ প্রকাশ পায়। একবার ডিপথিরিয়াতে আক্রান্ত হয়ে সেরে উঠলেই যে চিরতরের জন্য এ রোগের প্রতিরোধ-ক্ষমতা শরীরের মধ্যে সৃষ্টি হয়, একথা সত্য নয়। দ্বিতীয়বার আক্রমণের নজির অনেক আছে। রোগীর কাশি, তার ব্যবহৃত বাসনপত্র, জামা কাপড় ইত্যাদির সংস্পর্শে এলে রোগ হবার সম্ভাবনা যথেষ্ট থাকে।

ডিপথিরিয়া নানা শ্রেণীর। যে ডিপথিরিয়ার কথা আমরা সচরাচর শুনে থাকি তা হলো—(i) Faucial Diptheria। সাধারণত শিশুরাই এর প্রধান শিকার। এছাড়া আরও কয়েক ধরণের ডিপথিরিয়ার কথা জানা গেছে যথা—

(ii) Laryngeal Diptheria (ল্যারিঞ্জিয়াল ডিপথিরিয়া) [ল্যারিংসের]

(iii) Nasal Diptheria (নেজাল ডিপথিরিয়া) [নাকের]

(iv) Aural ,, [কানের]
(v) Conjunctival ,, [চোখের]
(vi) Cutancous ,, [চর্মের]

Faucial শ্রেণীর ডিপথিরিয়ার রোগীরা সাধারণত শিশু। রোগের প্রারম্ভে তাদের মাথার যন্ত্রণা ও হাতে-পায়ে ব্যথা হয়। তখন গলায় কোন উপসর্গ প্রকাশ পায় না। বমি ও পেটের অসুখ প্রথম থেকেই সুরু হ'তে পারে। এরপর রোগীর টনসিলে অথবা fauces এ পীতাভ-ধূসর বর্ণের ছোপ ধরতে আরম্ভ করে। এগুলি ধীরে ধীরে বড় হয় এবং চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ক্রমে এর রং গাঢ় হয়ে সবুজাভ কালো দেখায়। জিভ শুকনো এবং ময়লা পড়া থাকে। জ্বর 99° থেকে 101° ফাঃ এর মধ্যে থাকে। 3-4 দিন বাদে জ্বর স্বাভাবিক অবস্থায় আসে।

ল্যারিঞ্জিয়াল ডিপথিরিয়া বড়োদের হয় না বললেই চলে। এতে ল্যারিংস আক্রান্ত হয় বলে শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট প্রথম থেকেই অনুভূত হয়। প্রথম অবস্থাতে চিকিৎসা না হলে এই শ্রেণীর ডিপথিরিয়া মারাত্মক হ'তে পারে।

এ রোগের প্রধান উপসর্গ রক্তচলাচলে ব্যাঘাত সৃষ্টি। টক্সিক মায়োকার্ডাইটিস্ নামে একধরণের রোগ সৃষ্টি হওয়াতে রক্তচলাচলে প্রচণ্ড বাধার সৃষ্টি হয়।

আর একটি উপসর্গ—প্যালেট, চোখ. ল্যারিংস, হাত-পা, কোমর, ঘাড়, বুক, প্রভৃতি কোন স্থানের পক্ষাঘাত। প্রায় মাসখানেক লাগে পক্ষাঘাত কমতে। এছাড়া আরো কতগুলি রোগ উপসর্গরূপে দেখা দেয় এবং রোগযন্ত্রণাকে আরো বাড়িয়ে তোলে। এগুলির মধ্যে অন্যতম ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া, ওটাইটিস মিডিয়া (Otitis media), নেফ্রাইটিস ইত্যাদি।

বর্তমান কালে উন্নততর চিকিৎসা পদ্ধতির জন্যে মৃত্যুর হার অনেক কমে গেছে। তবে এখনও শতকরা দুই থেকে দশ ভাগ ক্ষেত্রে

রোগ এমন জটিল থাকে যে, তা সারান কঠিন হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রাণঘাতী হ'য়ে পড়ে।

ডিপথিরিয়া রোগের কবল থেকে রেহাই পাবার জন্যে টীকার ব্যবস্থা আছে। দু'মাস বয়স হ'লেই শিশুকে টীকা দেওয়া বাঞ্ছনীয় তার নিয়মাবলী আছে। কম্পাউণ্ডার বা হাতুড়ে ডাক্তারের কাছে না গিয়ে সুচিকিৎসকের কাছে যাওয়া একান্ত কর্তব্য।

অসুখ হ'লে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রোগ নির্ণীত হওয়া উচিত। কলকাতার বেলেঘাটা অঞ্চলে সংক্রামক রোগের হাসপাতালে ডিপথিরিয়া রোগের চিকিৎসা করা হয়। সিরাম (serum), পেনিসিলিন, অ্যাড্রিনালিন হাইড্রোক্লোর, অ্যান্টিটক্সিন, বেনাড্রিন, প্রভৃতি ওষুধ চিকিৎসার জন্যে ব্যবহৃত হয়। প্রয়োজনবোধে শ্বাসনালীতে অস্ত্রোপচার করতে হয়।

গলা পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত তরল খাদ্য দেওয়া হয়। কৃত্রিম উপায়ে (এনেমা দিয়ে) একদিন অন্তর মলত্যাগ করানো হয়।

রোগ সম্পুর্ণভাবে সেরে গেলেও সচেতন থাকতে হয়। কোন ভারী কাজ বা পরিশ্রমের খেলা করতে দেওয়া উচিত নয়; অন্ততঃ ছয় মাসের মধ্যে।

কলেরা

এক সময় বাংলাদেশে কলেরা রোগ বিশেষ ঋতুতে হ'তো। আজকাল সব সময়েই হচ্ছে। বাংলাদেশের দক্ষিণাংশে, চীনের মধ্য অঞ্চলে, কলেরা প্রতিবছরই সংক্রামকরূপে দেখা দেয়। ভারতে কলেরা যখনই আরম্ভ হয়, তখনই তা মহামারীরূপে আত্মপ্রকাশ করে, পূর্বাপর তার বহু নজির আছে।

কলেরা যে মহামারী আকারে দেখা দেয়, তার জন্যে দায়ী মানুষ নিজেই। এক স্থান থেকে অন্য স্থানে মানুষ নিজের সঙ্গে নিয়ে যায় কলেরা রোগের মারাত্মক বীজাণু। যেখানে জনসমাগম বেশী সেখানে বেশী সংখ্যায় লোক কলেরায় আক্রান্ত হয়।

বিশেষজ্ঞরা বলেন ভারতে কলেরা যে মহামারী আকারে দেখা দেয় তার অন্যতম কারণ এখানকার বাতাসের আর্দ্রতা। তাঁরা বলেন বাতাসের আর্দ্রতা ও রোগ-সংক্রমণের মধ্যে এক বিশেষ যোগাযোগ বর্তমান। মার্চ-এপ্রিল মাস গ্রীষ্মকাল, তখন তাপমাত্রা ক্রমে বাড়তে থাকে। এই অবস্থা থাকে মে-জুন পর্যন্ত। তখন এখানকার বাতাসের আর্দ্রতাও ক্রমশ বাড়তে থাকে, এখানে কলেরার দাপট এই সময়কালের মধ্যেই বেশী দেখা যায়। ক্রমে যখন মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয়, সুরু হয় অঝোর ধারায় বৃষ্টি, তখন হ্রাস পায় রোগের আক্রমণ।

ভারতের পূর্ব উপকূলে সেল-ফিস পাওয়া যায় প্রচুর পরিমাণে। এই মাছ কলেরার বীজাণু বহন করতে পারে খুব ভালভাবে। যারা ঐ মাছ খাদ্যরূপে গ্রহণ করে তারা সহজেই আক্রান্ত হয় কলেরা রোগে।

ভারতে যে কলেরা রোগ সর্বজন পরিচিত তার বৈজ্ঞানিক নাম—'কলেরা এশিয়াটিকা'। ডাঃ কক্ 1883 সালে মিশরে এই রোগবীজাণু

আবিষ্কার করেন। 1884 সালে কলকাতায় এসে তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাঁর মিশরে লব্ধ অভিজ্ঞতার সত্যতা প্রমাণ করেন। কিন্তু উষ্ণমণ্ডলীয় রোগ-বিশেষজ্ঞ ডাঃ রোজার্স বলেন যে এ কৃতিত্ব সম্পূর্ণভাবে ডাঃ ককের প্রাপ্য নয়। ভারতের শল্যবিদ ডাঃ ম্যাকনামারা (মেজর), ডাঃ ককের অনেক আগেই বলেছেন যে কলেরার বীজাণু জলের মধ্যে জীবন্ত থাকে এবং সে অবস্থায় তার বংশবৃদ্ধি অতি দ্রুতহারে ঘটে থাকে।

কলেরার বীজাণু দেখতে একটি কমার (,) মতো—তাই এর নামকরণ হয়েছে 'কোমা ব্যাসিলাস'। এর দৈর্ঘ্য 1·5 থেকে 2 মিউ (μ), ব্যাস 0·5 থেকে 0·6 মিউ। দৈর্ঘ্যে কোমা ব্যাসিলাস্ যক্ষ্মা বীজাণুর অর্ধেক, কিন্তু দ্বিগুণ স্থূলকায়। এ রোগের বীজাণু জলীয় পদার্থে দ্রুত স্থানান্তরিত হতে পারে। রোগীর মলের মধ্যে অসংখ্য বীজাণু থাকায় তা রোগ ছড়ানোর উৎস হয়ে দাঁড়ায়। ঐ মলে মাছি বসলে তার গায়ে, পায়ে বীজাণু লেগে যায়। তখন সে কোন খোলা খাবার, দুধ, ইত্যাদির উপর বসলে, বীজাণু দূষিত করে খাদ্যসামগ্রী। আর তা খেলে কলেরা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। রোগের সংক্রমণকাল 2 থেকে 5 দিন।

কলেরাকে সাধারণত পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

(1) Ambulatory
(2) Choleraic diarrhoea
(3) Cholerine
(4) Cholera Sicca
(5) Cholera gravis

সাধারণত কলেরা রোগের সংক্রমণকাল দুই থেকে পাঁচ দিন হলেও ক্ষেত্র বিশেষে মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এই রোগের প্রকোপ প্রকাশ পেতে পারে।

Cholerine শ্রেণীর কলেরাতে রোগীর পেটে প্রচণ্ড ব্যথা আরম্ভ হয় আকস্মিকভাবে। তারপরে রোগী ঘন ঘন মলত্যাগ করতে থাকে, রং হয় চা-ধোয়া জলের মত।

Cholera Sicca শ্রেণীতে সমস্ত শরীর খুব তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হ'য়ে রোগী মারা যায়। অন্য কোন উপসর্গ ভালভাবে প্রকাশ পাবার আগেই সব শেষ।

Cholera gravis—সাধারণ রোগ। এই ধরণের কলেরাই শতকরা 95 ভাগ ক্ষেত্রে হয়। মল জলের মতো, বারে বারে মলত্যাগের প্রবণতা, মাথা-ধরা, পেটে অস্বস্তি, গা-বমি ভাব এবং বমি—এই ধরণের নানা উপসর্গ আগেই দেখা যায়। এগুলি প্রকাশিত হবার প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা পরে রোগের আসল চেহারা বেরোয়।

রোগাক্রমণকে তিন ধাপে ভাগ করা যায়।

(1) Stage of Evacuation ঃ এই ধাপের স্থায়িত্বকাল তিন থেকে বারো ঘণ্টা পর্যন্ত। যন্ত্রণাবিহীন পেটের অসুখ নিয়ে এর সূত্রপাত। ক্রমে বমি আরম্ভ হয়। বারে বারে মলত্যাগের প্রবণতা দেখা দেয়। শেষে মলের রং সাদা, চালধোয়া জলের মতো হ'য়ে যায়। ক্রমে দেহ অবসন্ন হ'য়ে পড়ে। হাতে-পায়ে খেঁচুনী ধরে। রোগী অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত বোধ করে এবং জল পান করবার জন্যে অস্থির হয়ে ওঠে। গায়ের চামড়া হিমশীতল হয় এবং কুঁচকেও যায়। ঠোঁট ও কানের ডগা হয় নীলচে। গলার স্বর খুব ক্ষীণ ও জড়ানো হয়ে আসে। শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বাড়ে, রক্তের চাপ অস্বাভাবিকভাবে কমে যায় এবং নাড়ী পাওয়া দুষ্কর হয়।

(2) রোগের দ্বিতীয় ধাপের নাম—Collapse stage। বমি বা মলত্যাগের প্রবণতা কমে, কিন্তু রোগী ক্রমেই আরো অসুস্থ হয়ে পড়ে। রক্তচলাচলে অত্যন্ত বিঘ্ন উপস্থিত হবার জন্যে আঙ্গুলের ডগা, কান, নাকের ডগা ও ঠোঁটে নীলাভ ভাব গাঢ় হয়। প্রস্রাব হয় না বললেই চলে, রক্ত চলাচল প্রায় বন্ধ হবার জন্যে ইউরেমিয়া নামে এক

মারাত্মক উপসর্গ আরম্ভ হয়। তার ফলে রোগী তিন থেকে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে মারা যায়।

(3) তৃতীয় ধাপকে বলা হয় Stage of Reaction। রোগীর অবস্থা একটু ভালো হতে আরম্ভ করলে দেহের উত্তাপ স্বাভাবিক পর্যায়ে আসে। রক্ত চলাচলের উন্নতি ঘটে। প্রস্রাবের পরিমাণ বাড়ে এবং মলে হলুদ রং ধরে। রোগী সপ্তাহের মধ্যে আরোগ্যের পথে যায়।

যে সব রোগীর ক্ষেত্রে আরোগ্য লাভে দেরী হয় তারা হঠাৎ টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হ'য়ে পড়তে পারে। তখন তাদের দেহের উত্তাপ বেড়ে যায়। মুখ হয় আরক্তিম, জিভ শুকনো এবং তাতে বাদামী রঙের ছোপ থাকে। রোগী প্রলাপ বকতে সুরু করে, প্রস্রাবের পরিমাণ খুব কমে যায়। হিক্কা, বিকার, মাংসপেশীতে যন্ত্রণা ইত্যাদি নানা উপসর্গ দেখা দেয়। কিডনী বা বৃক্কে অম্লাধিক্য এবং ইউরেমিয়া রোগ হবার সম্ভাবনা প্রবল হয় এবং তার ফলে রোগী সহজেই মৃত্যুর পথে এগিয়ে যায়।

এই রোগের সঙ্গে আরো কয়েকটি রোগ বাড়তি উপসর্গরূপে আসতে পারে। সেগুলি হলো—ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া, কোলেসিস্টাইটিস্, প্যারোটাইটিস, বেড-সোর, আঙুল-কান ও মূত্র-দ্বারে ঘা, কনজাংকটিভাইটিস্ (Conjunctivitis), কার্নিয়াতে ঘা ইত্যাদি।

কলেরাতে মৃত্যুর হার সর্বদাই বেশী। ভারতে এক সময়ে এ রোগে মৃত্যুর হার ছিল শতকরা 70 জন। 1908 সালে 54·2%, তার পরে ক্রমশ উন্নত চিকিৎসা পদ্ধতি অনুসৃত হবার ফলে মৃত্যুর হার বর্তমানে শতকরা কুড়ি থেকে ত্রিশের মধ্যে নেমেছে। পাঁচ বছরের কম বয়সের শিশু, পঞ্চাশ বছরের বেশী বয়স্ক লোক এবং গর্ভবতী মহিলারা কলেরায় আক্রান্ত হলে সহজে রেহাই পান না। কলেরার চিকিৎসার কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই এর সংক্রমণ প্রতিরোধের কথা চিন্তা করতে হয়। রোগীকে এমন স্থানে এবং এমনভাবে রাখতে হয় যেখানে মাছির উপদ্রব থাকে না। রোগীর বমি, মল-মূত্র

সম্পূর্ণভাবে নির্বীজন করতে হয়। এগুলি এমনভাবে ধ্বংস করে ফেলতে হয় যাতে অন্যত্র এই রোগ-বীজাণু ছড়িয়ে না পড়তে পারে।

রোগীর জামা-কাপড় খুব সতর্কতার সঙ্গে বীজাণুশূন্য করতে হয়। জল, দুধ, খাবার সব কিছুই গরম করে বীজাণুমুক্ত করা একান্ত আবশ্যক। এই সময় ঠাণ্ডা ঘরের মাংস, মাছ, কাঁচা ফল খেলে তা থেকে রোগ আসা অস্বাভাবিক নয়। ফুটন্ত জল, ক্লোরিন দিয়ে বীজাণুশূন্য করে ঠাণ্ডা অবস্থায় পাত্রে রেখে দেওয়া উচিত। সেই জল ছাড়া অন্য কোন জল পান করা উচিত নয়। খাবার আগে নির্বীজক পদার্থ দিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে নেওয়া প্রয়োজন। খাবার জলের গ্লাস, থালা, বাটি, সবই গরম জলে ধু'য়ে নিতে হয়। বাড়ীতে পাতকূয়ো বা ইঁদারা থাকলে সেই জলে পটাশ পারমাঙ্গানেট মিশিয়ে জল বীজাণুশূন্য করতে হয়।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় কলেরার ভ্যাকসিন তৈরী হয়। 1915-19 সালে বলকান যুদ্ধের সময় বাটাভিয়া অঞ্চলে কলেরার প্রতিরোধক হিসাবে Haffkine's inoculation খুব কার্যকরী হ'য়েছিল। পরিসংখ্যানে জানা গেছে যে 1905 সাল থেকে 1916 সাল সময়ের মধ্যে ভারতে প্রতি বছর তিন লক্ষের বেশী লোক এই রোগে মারা যে'ত। ভ্যাকসিন চালু হওয়ার পর মহামারী দমন করা সহজ হয়েছে।

ভারতে কলেরার আক্রমণ দেখে ডাঃ রোজার্স বলেছিলেন যে, তীর্থযাত্রীদের কলেরার টীকা গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক হোক। তাঁর এই ব্যবস্থা মেনে নেওয়ার সুফল পাওয়া গেছে।

কলেরা রোগে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা—শিরাপথে লবণ-জল দেওয়া। অস্বাভাবিক মাত্রায় মলত্যাগের ফলে রোগীর দেহ থেকে প্রচুর লবণ বেরিয়ে আসে। রক্ত ও লবণ সঠিক অবস্থায় রাখার জন্যে রোজার্স দুটি দ্রবণের কথা বলেছেন। এই তরল পদার্থ শিরাপথে রোগীর দেহে প্রবেশ করানো হয়।

প্রথমটিতে—সোডিয়াম ক্লোরাইড—120 গ্রেণ
ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড – 4 গ্রেণ
পরিশ্রুত জল—1 পাঁইট

একে বলা হয় হাইপারটনিক স্যালাইন।

দ্বিতীয়টির মধ্যে থাকে—
সোডিয়াম বাইকার্বনেট—180 গ্রেণ
সোডিয়াম ক্লোরাইড—90 গ্রেণ
পরিশ্রুত জল—1 পাঁইট

এই তরলটি ক্ষারীয় দ্রবণ। ইহা অম্লাধিক্য ও ইউরেমিয়া রোগ দমনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

যে সব ওষুধ কলেরাতে ব্যবহার করা চলতে পারে তার একটি তালিকা দিচ্ছি। এ প্রসঙ্গে একথা বলা বাহুল্য যে যারা চিকিৎসক নন, তারা কোন অবস্থাতেই যেন নিজেরা চিকিৎসার ব্যবস্থা না করেন। তবে ফোটানো এক গ্লাস জলে এক চামচ চিনি, এক চিমটে নুন ও খাবার সোডা মিশিয়ে খাওয়ানো চলতে পারে। তারপর চিকিৎসক ডাকতে হবে।

(1) সালফা গোয়ানিডিন
(2) সালফা সাক্সিডিন
(3) ডাই-হাইড্রো-ষ্ট্রেপ্টোমাইসিন এবং ষ্ট্রেপ্টোমাইসিন
(4) কোরাম ফেনিকল
(5) টেট্রোসাইক্লিন
(6) কেওলিন
(7) ফর্মোসিবাজল
(8) স্যালাইন

শুধু মহামারীর সময়েই নয়, চৈত্র থেকে আশ্বিন মাস পর্যন্ত যে কোন সময়ে পেটের গণ্ডগোল হলেই চিকিৎসকের কাছে যাওয়া উচিত।

প্রতিটি লোকের বছরে অন্তত একবার কলেরার টীকা নেওয়া অবশ্য কর্তব্য। দু'বার নিলেই ভাল হয়, যেহেতু যে টীকা আমরা নিয়ে থাকি তার কর্মক্ষমতা চার থেকে ছ'মাস পর্যন্ত থাকে।

ভাইটামিন-অভাবজনিত রোগ

আমাদের খাদ্যতালিকার মধ্যে আছে আমিষ বা প্রোটিনজাতীয় খাদ্য, ফ্যাট বা চর্বিজাতীয় খাদ্য, কার্বোহাইড্রেট বা শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য, লবন ও জল। এ ছাড়া আর একটি বিশেষ দ্রব্য আমাদের খাদ্যতালিকার মধ্যে আছে বা থাকা একান্তভাবে উচিত, তার নাম ভাইটামিন। জীবনধারণের জন্য ভাইটামিনের প্রয়োজনীয়তা অসীম। সাত প্রকার ভাইটামিনের নাম আমরা জানি। ভাইটামিন এ, বি-কমপ্লেক্স, সি, ডি, ই, কে এবং পি।

খাদ্যদ্রব্যের পরিপাক ক্রিয়ায় ভাইটামিন খুব কাজে লাগে। শিশুদের দেহ বৃদ্ধি এবং বয়স্কদের কর্মক্ষমতা বজায় রাখার জন্য সর্দি ও নানাবিধ সংক্রামক রোগের প্রতিরোধকল্পে ভাইটামিন অবশ্য প্রয়োজনীয়। খাদ্যের অভাব হ'লে শারীরিক নানা অস্বাচ্ছন্দ্য, মাথাধরা ইত্যাদি দেখা দেয়। শিশু, অসুস্থ লোক, গর্ভবতী স্ত্রীলোক এবং যারা স্বাস্থ্যের প্রতিকূল আবহাওয়াতে বাস করে, তাদের খাদ্যে ভাইটামিনের অভাব ঘটলে খুব শীঘ্রই নানা ব্যাধিতে আক্রান্ত হ'য়ে পড়ে।

সাধারণত শাকসব্জীতে, ফলমূলে, অধিক পরিমাণে ভাইটামিন থাকে। তবে প্রাণীদেহের তন্তু এবং অন্য কয়েকটি যন্ত্রেও (যেমন লিভার) ভাইটামিন প্রচুর থাকে। কাজেই শাকসব্জী এবং মাছ-মাংস-ডিম প্রভৃতি থেকে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় ভাইটামিন পাই। দুধের চর্বি অংশে, কড ও হ্যালিবাট মাছের যকৃতের তেলে প্রচুর পরিমাণে 'ভাইটামিন এ' থাকে। কিন্তু বনস্পতি ঘিয়েতে এই ভাইটামিন খুব কম থাকে। গাজর, স্পাইনাক, কাঁচা শাকসব্জী, বাঁধাকপি ইত্যাদিতে এই ভাইটামিন যথেষ্ট থাকে।

'ভাইটামিন-এ'র সঙ্গে দৃষ্টিশক্তির এক অদ্ভুত যোগাযোগ আছে। দেহে এর অভাব ঘটলে এক ধরণের চক্ষুরোগ হয়। বাংলায় তাকে বলে রাত্র্যান্ধতা। এই রোগে থেকে অন্ধকারে বা অল্প আলোতে কিছুই দেখতে পায় না। অথচ দিনের আলো বা কৃত্রিম উজ্জ্বল আলোতে ভালোভাবে সব জিনিস দেখতে পায়। এ ছাড়া গায়ের চামড়া খস্‌খসে হয়, মেরুদণ্ড, মাথার খুলি ইত্যাদি জায়গাতে অস্বাভাবিক ভাবে হাড় গজাতে থাকে। খাদ্যে এর অভাব হ'লে সহজেই সর্দি, ব্রঙ্কাইটিস্, পিত্তথলির অসুখ এবং আরো অনেক অসুখ আসে। খাদ্য 'ভাইটামিন-এ' অধিক পরিমাণে থাকলে বা অত্যন্ত প্রয়োজনের সময় তৈরী 'ভাইটামিন-এ' ওষুধরূপে খেলে রোগ সেরে যায়। রেলচালক, মোটর বা লরিচালক অর্থাৎ যাদের সর্বদাই দূরস্থ রঙীন আলোক-সংকেত দেখে গাড়ী চালাতে হয়, তাদের সর্বদাই একটু বেশী করে 'ভাইটামিন-এ' খাওয়া দরকার। বয়স্কদের প্রতিদিন 1·25 মিলিগ্রাম 'ভাইটামিন-এ' খাওয়া উচিত। এই নির্দিষ্ট পরিমাণ ভাইটামিন 2টি ডিম, 50 গ্রাম মেটে (লিভার), 50 গ্রাম গাজর অথবা 200 গ্রাম পাকা টমাটোর মধ্যে থাকে।

বি-কমপ্লেক্স অনেকগুলি ভাইটামিন দিয়ে তৈরী। সেগুলি যথাক্রমে —(1) থিয়ামিন, (2) নিকোটিনিক অ্যাসিড, (3) রিবোফ্লোভিন, (4) ফোলিক অ্যাসিড, (5) প্যানটোথেনিক অ্যাসিড, (6) পিরিডক্সিন, (7) বায়োটিন, (8) ভাইটামিন বি-12, (9) কোলিন অ্যাডিনিলিক অ্যাসিড, (10) প্যারা-অ্যামিনো বেনজোইক অ্যাসিড, (11) আইনোসিটল।

এই সমস্ত ভাইটামিন ডাল, বাদাম, ঈস্ট, কাঁচা শব্জী, ডিমের হলুদ অংশ, মাংস, মাছ, মেটে, দুধ ইত্যাদির মধ্যে যথেষ্ট থাকে। এই শ্রেণীর ভাইটামিনের অভাবে মারাত্মক রোগ দেখা দেয়।

প্রথমেই বেরিবেরি রোগের কথা বলা যাক। থিয়ামিন বা 'ভাইটামিন বি-1' খাদ্যে উপযুক্ত পরিমাণে না থাকলে বেরিবেরি

রোগ হয়। এ রোগের কথা আমরা অনেকেই জানি। হাত-পা ফুলে যায়, যন্ত্রণা সুরু হয়, অনেক সময় অঙ্গ অসাড় হয়ে পড়ে। শ্বাসকার্য স্বাভাবিক থাকে না। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে খুব কষ্ট হয়। হৃদপিণ্ডে যন্ত্রণা বোধ হয়। তা ছাড়া অবসাদ, দুর্বলতা, ক্ষুধামান্দ্য দেখা যায় ও ক্রমশ হাঁটাচলা করবার ক্ষমতা কমে আসে।

প্রতিদিন অন্তত 2-3 মিলিগ্রাম 'ভাইটামিন বি-1' খেলে এই রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়। 100 গ্রাম গমজাত দ্রব্যে এই পরিমাণ ভাইটামিন পাওয়া যেতে পারে। তা ছাড়া ডাল, ঈস্ট. প্রভৃতিতে এই ভাইটামিন থাকে। দুধ, মাংস, শাক-সব্জীতে সামান্য পরিমাণে থিয়ামিন থাকে। সাদা ময়দা এবং কলে ছাঁটা খুব মিহি ও সাদা চাউলে এই ভাইটামিন প্রায় থাকে না বললেই চলে।

বি-কমপ্লেক্সর অন্তর্গত নিকোটিনিক অ্যাসিডের অভাবে লোকের 'পেলেগ্রা' নামে আর এক ধরনের সর্বনাশা রোগ হয়। এই রোগে বিশেষ ধরণের চর্মরোগ, পরিপাক যন্ত্র ইত্যাদির নানা গোলযোগ সুরু হয়। খাদ্যের সঙ্গে প্রত্যহ 10 থেকে 12 মিলিগ্রাম নিকোটিনিক অ্যাসিড খাওয়া প্রয়োজন।

প্রাণীদেহের যকৃৎ (মেটে) ও কিডনীতে প্রচুর পরিমাণে এই ভাইটামিন থাকে। কাজেই খাদ্যের মধ্যে এগুলি থাকা দরকার। রিবোফ্লেভিনের অভাবে ঠোঁটে, চোখের কর্ণিয়াতে ঘা হয়। তাছাড়া চুল খসে পড়তে থাকে আর অনেক সময় চর্মে দাগ পড়ে। মাংস, দুধ ও গমজাত দ্রব্যে এই ভাইটামিন থাকে। প্রতিদিন অন্তত 2-3 মিলিগ্র্যাম রিবোফ্লেভিন খাওয়া দরকার।

ফোলিক অ্যাসিড রক্তের লোহিত কণিকা তৈরি করতে সাহায্য করে। কাজেই খাদ্যে ফোলিক অ্যাসিডের ঘাটতি হ'লে একশ্রেণীর রক্তাল্পতা রোগ হয়। মেটে, শাকশব্জীতে এই ভাইটামিন পাওয়া যায়। বয়স্কদের দৈনিক 1-5 মিলিগ্রাম ফোলিক অ্যাসিড গ্রহণ করা প্রয়োজন।

প্রাণীদের যকৃতে, মাংসের রসে এবং দুধে "ভাইটামিন বি-12" পাওয়া যায়। এর অভাবে এক মারাত্মক ধরণের রক্তাল্পতা রোগ দেখা দেয়। লোহিত কণিকা তৈরি এবং শরীর বৃদ্ধির জন্যে এই ভাইটামিনের একান্ত প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

ভাইটামিন-সি (vit-c) বা অ্যাসকরবিক্ অ্যাসিডের অল্পতা দীর্ঘদিন ধরে চললে স্কার্ভি নামে এক ধরণের রোগ দেখা দেয়। মাথা ঘোরা, গা-বমি ভাব, ক্লান্তি, শক্তিহীনতা এবং হাত-পায়ে ব্যথা ইত্যাদি নানা উপসর্গ এই রোগের। এর প্রধান উপসর্গ হ'লো হেমোরেজ বা দেহমধ্যে নিজ থেকেই রক্তক্ষরণের প্রবণতা। মানসিক অবসাদ (depression and melancholia) রোগীকে আচ্ছন্ন করে। ক্ষুধামান্দ্য হয়, যদিও বা রোগী জোর করে খেতে চেষ্টা করে, বাদ সাধে তার দাঁতের গোড়া, মাড়ি। মাড়িতে হয় যন্ত্রণা, আর কোন কিছু চিবুতে গেলেই দর্‌দর্‌ ক'রে রক্ত বেরোয় দাঁতের গোড়া থেকে। চর্ম শুকনো ও খস্‌খসে হয়ে যায়। মানসিক অবসাদ যত বাড়তে থাকে, মাংসপেশীর কর্মক্ষমতাও তত কমতে থাকে। ঠোঁট নীলাভ হয় দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে লেগে থাকে জমাট রক্তপিণ্ড।

ক্রমে পায়ের মাংসপেশী ফুলে যায়। নাক, পাকস্থলী, অন্ত্রাশয় প্রভৃতি স্থান থেকে রক্ত ক্ষরিত হয়। প্রত্যত 250 মিলিগ্রাম থেকে 2 গ্রাম বা তারও বেশী মাত্রায় ভাইটামিন-সি স্কার্ভি রোগে প্রয়োগ করা হয়।

ভাহটামিন-ডি অভাবে 'রিকেট' রোগ হয়। যখন শিশুর দেহ দ্রুতহারে বৃদ্ধি পাবার কথা, তখন তার দেহে ডি-ভাইটামিনের চাহিদা খুব বেশী থাকে। যেসব বাড়ীতে পর্যাপ্ত পরিমাণে সূর্যালোক প্রবেশ করে না, সেই সব বাড়ীর শিশুদের খাদ্যে ভাইটামিন ডি-এর অভাব ঘটলে 'রিকেট' রোগ দেখা দেবার সম্ভাবনা অধিক থাকে।

'কড্-লিভার অয়েল'-এ 'ভাইটামিন্ ডি' প্রচুর পরিমাণে থাকে এবং পনীর, মাখন, ডিম প্রভৃতিতেও কিছু পরিমাণে থাকে। কার পক্ষে

কতটা দৈনিক খাওয়া দরকার তা বলা বেশ শক্ত, তবে জন্ম থেকে 20 বছর বয়স পর্যন্ত দৈনিক 400 আন্তর্জাতিক-ইউনিট 'ডি' ভাইটামিন খাওয়া দরকার।

শস্যের দানায় এবং কাঁচা শাকশবজীতে 'ভাইটামিন-ই' প্রচুর পরিমানে থাকে। এই ভাইটামিন বন্ধ্যাত্ব নিবারক বলে জানা যায়।

ভাইটামিন-কে—বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যে, বিশেষ করে কাঁচা শাকশবজীর মধ্যে যথেষ্ট থাকে। এই ভাইটামিনের সাহায্যে যকৃতে প্রোথম্বিন তৈরি হয়। এটি রক্তস্তম্ভকের কাজ করে।

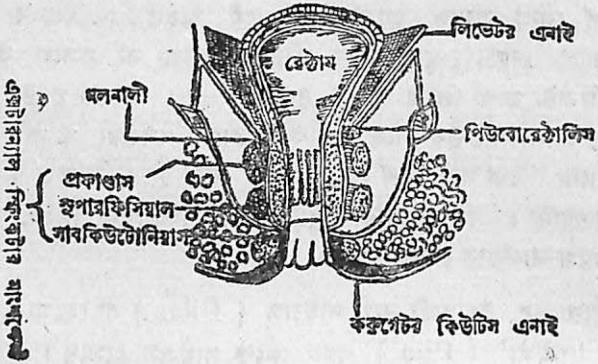
অর্শ

অর্শ রোগ সম্বন্ধে আমরা সকলেই সচেতন। অনেক লোক এই রোগে কষ্ট পেয়ে থাকে, হাঁটতে গেলে বা বসলে কাপড়ের পিছন দিকটা রক্তে ভি:জ যায়, দুর্গন্ধও হয়। রাস্তা-ঘাটে, বাড়ির দেয়ালে, ল্যাম্পপোষ্টের গায়ে অনেক বিজ্ঞাপন দেওয়া থাকে। তাতে লেখা থাকে 'কে বলে অর্শ সারে না ? সাত দিনে নিশ্চিত আরোগ্য-লাভ, ইত্যাদি'। বিভ্রান্ত রোগ ছুটে যায় ঐ বিজ্ঞাপন দেখে, আবার ফিরে আসে ব্যর্থতার বোঝা নিয়ে।

অর্শরোগের ইংরেজী নাম পাইলস্ (Piles) বা হেমোরয়েডস্। ল্যাটিন 'পাইলা' (Pila) শব্দ থেকে পাইলস্ এসেছে। 'পাইলা' শব্দের অর্থ স্তুপ বা পিণ্ড।

এ রোগ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার আগে আমাদের মল-নালী বিষয়ে কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করতে হবে। রেক্টাম বা মলভাণ্ডের নীচের অংশ হচ্ছে মল-নালী। পিউবোরেক্ট্যালিস (Puborectalis) নামে মাংসপেশীটি যে স্থানে জড়িয়ে আছে রেক্টামকে, রেক্টামের সেই স্থান থেকে সুরু হ'য়েছে মল-নালী। এটা লম্বায় দেড় ইঞ্চি এবং একটা গোলাকৃতির নলের মতো ; চারদিকে বৃত্তাকারে ঘিরে থাকে ইন্টারন্যাল ও এক্সটারন্যাল স্ফিংক্টার মাংসপেশীদ্বয়। ইন্টারন্যাল স্ফিংক্টার মাংসপেশী মল-নলীর উপরের দুই-তৃতীয়াংশ এবং এক্সটারন্যাল স্ফিংক্টার মল-নালীর নীচেকার দুই-তৃতীয়াংশ ঘিরে থাকে। একারণেই মাঝখানের এক-তৃতীয়াংশ জায়গাতে একটি অপরটির উপর লেপ্টে থাকে। এক্সটারন্যাল স্ফিংক্টার মাংসপেশী আবার তিনভাগে বিভক্ত। তিনটি আংটির মতো তিন সেট গোলাকৃতির মাংসপেশী। উপরকারটির নাম সাবকিউটেনিয়াস এক্সটারন্যাল স্ফিংক্টার। মাঝেরটি

হলো সুপারফিসিয়াল এক্সটারন্যাল স্ফিংকটার এবং ভিতরেরটির নাম প্রফাণ্ডাস এক্সটারন্যাল স্ফিংক্টার। এগুলি নীচের দিকে আরো এক ধরণের মাংসপেশী আছে। তার নাম করুগেটর কিউটস এনাই।

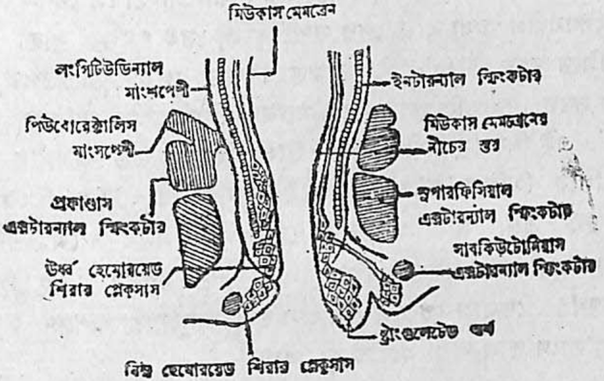


(8 নং চিত্র)

রেক্টামের লংগিটুডিন্যাল মাংসপেশী স্ফিংক্টার মাংসপেশীর সঙ্গে বেশ শক্তভাবে আটকে থাকে।

মল-নালীর ভিতরদিকের দেয়ালের সবচেয়ে উঁচু জায়গা থেকে মধ্য পর্যন্ত কলাম্নার এপিথেলিয়াম এবং পরে অর্থাৎ মধ্যভাগ থেকে শেষ পর্যন্ত, ষ্ট্রাটিফায়েড স্কোয়মাস এপিথেলিয়ান তন্তু দিয়ে ঢাকা থাকে। ঠিক যে জায়গা থেকে ষ্ট্র্যাটিফায়েড স্কোয়মাস এপিথেলিয়াম সুরু হ'য়েছে, সেই সংযোগস্থলে মিউকাস মেমব্রেন মল-নালীর মাংসপেশীর সঙ্গে দড়ির মত পাক খেয়ে জুড়ে থাকে। একে বলা হয় মিউকোসাল লিগামেন্ট। এই লিগামেন্টটি অনেকটা সীমানার কাজ করে। এর উপরের দিকে মিউকাস মেমব্রেনের নীচে ঊর্ধ্বে-হেমোরয়েড শিরা ও নীচের দিকে নিম্ন-হেমোরয়েড শিরা কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে। এই দুটি শিরা মল-নালী থেকে দূষিত রক্ত বয়ে নিয়ে যায়।

একথা আগেই বলা হয়েছে যে, মিউকোমাল লিগামেন্টের উপরের দিকে, মিউকাস মেমব্রেনের নীচে, উর্ধ্ব-হেমোরয়েড শিরা থাকে। এখানে এই শিরার নানা শাখা-প্রশাখাও আছে। কোন কারণে যদি এই শিরার শাখা-প্রশাখা কুঁচকে যায় তাহলে এ স্থানে জালক



(9নং চিত্র)

কুণ্ডলী বা প্লেক্সাসের সৃষ্টি হয়। এই কুণ্ডলীকে বলা হয় আভ্যন্তরীণ জালক কুণ্ডলী বা ইন্টারন্যাল ভেনাস-প্লেক্সাস। মল-নালীর নীচের দিকে, মেমব্রেনের নীচে 'নিম্ন-হেমোরয়েড শিরা'ও এই ভাবে একটি প্লেক্সাস তৈরি করে, এটিকে বলা হয় এক্সটারন্যাল ভেনাস-প্লেক্সাস।

মিউকাস মেমব্রেনের নীচ দিয়ে উর্ধ্ব-হেমোরয়েড শিরা উপরের দিকে লম্বালম্বিভাবে গিয়ে 'নিম্ন মেসেনটেরিক' নামে এক শিরায় সংযুক্ত হ'য়েছে। এই মেসেনটেরিক শিরা আবার স্পেলনিক শিরায় গিয়ে পড়েছে। পরিশেষে স্প্লেনিক শিরা যকৃতের পোর্ট্যাল শিরাতে গিয়ে মিলিত হয়েছে। এক শিরা থেকে অন্য শিরাতে রক্ত চলাচলের পথে কোন কপাট (Valve) না থাকাতে উর্ধ্বে-হেমোরয়েড শিরার সঙ্গে পোর্ট্যাল শিরার সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ।

অর্থাৎ রক্ত সোজাসুজি পোর্টাল শিরাতে পেঁাছাতে পারে। কিন্তু নিম্ন-হেমোরয়েড শিরার রক্ত অন্য নানা শিরার মাধ্যমে হৃদ্‌পিণ্ডের দক্ষিণ অলিন্দে (Right atrium) নীত হয়।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, পোর্ট্যালের শিরা-গোষ্ঠী যে কোন একটির মধ্যে কোনরূপ বাধা বা চাপের সৃষ্টি হলে, সেই চাপের ধাক্কা সম্পূর্ণ-ভাবে গিয়ে পড়ে উর্ধ্বে-হেমোরয়েড শিরার প্লেক্সাসের উপর। এই চাপের ফলে শিরাগুলি ফুলে উঠে মলদ্বার দিয়ে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়। এই শিরা-কুণ্ডলীর সঙ্গে উর্ধ্বে-হেমোরয়েড ধমণীর একটি শাখা গিয়ে মিলিত হ'য়েছে। এই স্ফীত অংশটিকে ঘিরে থাকে সংযোজক তন্তু, আর সবটাকে রেক্টামের মিউকাস মেমব্রেন ঢেকে থাকে। এর ফলে সবগুলি মিলে পিণ্ড সৃষ্টি করে। এই পিণ্ডটি-ই হচ্ছে অর্শ। ভেনাস-প্লেক্সাস-এর অবস্থিতি অনুসারে অর্শকে সাধারণ-ভাবে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা—

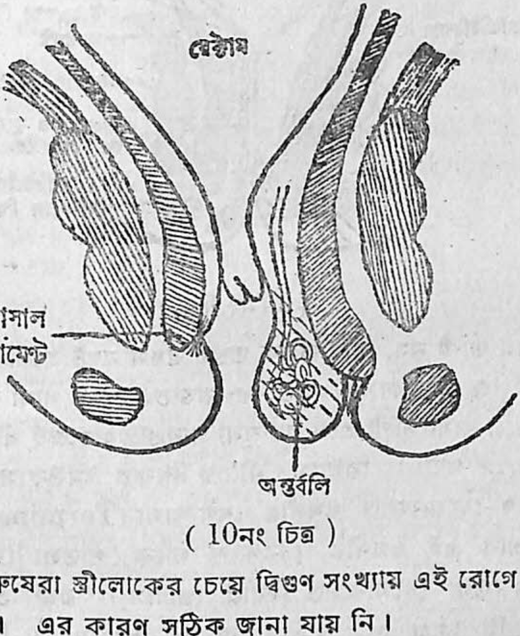
(1) বহির্বলি বা এক্সটারন্যাল পাইল্‌স্ এবং

(2) অন্তর্বলি বা ইনটারন্যাল পাইলস্

এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, অর্শ যখন মলদ্বার দিয়ে বেরিয়ে আসে তখন তাকে 'বলি' বলা হয়। এর রং ঈষৎ বেগুনী। একটু চাপ লাগলে শিরার গা-ফেটে রক্ত বেরোতে আরম্ভ করে। পোর্ট্যাল শিরার মধ্যে কোন বাধার সৃষ্টি হলে উর্ধ্ব-হেমোরয়েড শিরার প্লেক্সাস ফুলে ওঠে এবং অন্তর্বলির সৃষ্টি করে।

নিম্ন-হেমোরয়েড শিরার প্লেক্সাস ফুলে উঠে কোন চাপের ফলে ফেটে গেলে, রক্ত শিরার বাইরে এসে জমাট বাঁধে ও ঈষৎ নীল-রঙের রক্ত-পিণ্ড সৃষ্টি করে। এই গোলাকার পিণ্ডটিকে বলা হয়—হেমাটোমা। আগেই বলা হ'য়েছে যে নিম্ন—হেমোরয়েড শিরার প্লেক্সাস, মল-নালীর মেমব্রেনের নীচে থাকে, কাজেই এই শ্রেণীর অর্শকে বলা হয় বহির্বলি।

উপরের আলোচনা থেকে অর্শ রোগটি কি তা বুঝতে পারা গেল। এখন প্রশ্ন হ'তে পারে, বয়সের সঙ্গে এ রোগের কোন সম্পর্ক আছে কি না? নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি যে, চিকিৎসাশাস্ত্রে যেকথাই বলা হোক না কেন, এ রোগ কুড়ি বছর বয়স থেকে হ'তে



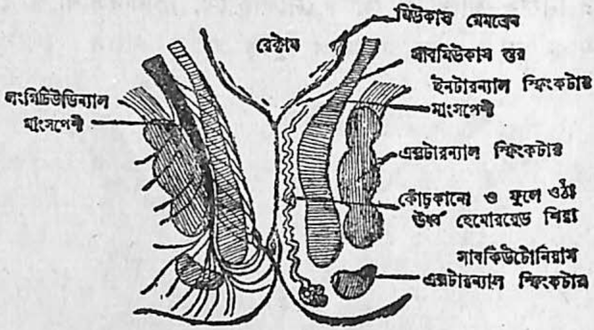
(10নং চিত্র)

পারে। পুরুষেরা স্ত্রীলোকের চেয়ে দ্বিগুণ সংখ্যায় এই রোগে আক্রান্ত হ'য়ে থাকে। এর কারণ সঠিক জানা যায় নি।

অর্শকে অনেকে বংশগত রোগ বলে থাকেন। একথা সর্বাংশে সত্য নয়।

মলত্যাগের সময় মল-নালীর ভিতরের দিকের খানিকটা উল্টে বেরিয়ে আসে। তার ফলে হেমোরয়েড শিরাতে স্বাভাবিক রক্তচলাচল ব্যহত হয়। কিন্তু সাধারণত লোকের মলত্যাগের পরে মল-নালীর তন্তুর স্থিতিস্থাপকতা ধর্মের জন্য তা আগের অবস্থায় ফিরে আসে। যদি কোন কারণে হেমোরয়েড শিরার রক্ত-চলাচল দীর্ঘ সময়ের জন্য

ব্যহত হয়, তাহলে মল-নালী এবং রেক্টামের শিরাগুলি ফুলে ওঠে আর দড়ির পাকের মত একেঁবেঁকে যায়।



(11নং চিত্র)

কেবল তা-ই নয়, স্থিতিস্থাপক তন্তুর স্বধর্ম নষ্ট হয়। এই অসাড়-তন্তু, চর্ম ও মিউকাস মেমব্রনের রক্তচলাচলে বাধা সৃষ্টি করে। রক্তচলাচলে বাধা সৃষ্টি হলে রক্তশূন্য স্থানগুলি সহজেই বীজাণুর দ্বারা আক্রান্ত হ'তে পারে। রেক্টামের নীচের দিকের মিউকাস মেমব্রেনের মধ্যে উর্ধ্ব-হেমোরয়েড ধমনীর শেষ শাখা (Terminal branch) থাকে, আর এই ধমণীর চারপাশে থাকে পাতলা দেয়ালবিশিষ্ট কপাটহীন উর্ধ্ব-হেমোরয়েড শিরার প্লেক্সাস। রক্ত চলাচল বন্ধ হ'লে এগুলি ফুলে ওঠে ও প্রাথমিক অর্শ (Primary Piles) সৃষ্টি হয়। উর্ধ্ব-হেমোরয়েড ধমণী, দক্ষিণ ও বাম এ দু'টি অংশে বিভক্ত। ডান দিকের শাখাটি আবার দু'টি উপশাখায় বিভক্ত। হেমোরয়েড ধমণী বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হবার জন্যে উক্ত প্রাথমিক অর্শ তিনটি পৃথক পিণ্ডে বলি) বিভক্ত হয়ে পড়ে। রোগ যখন গুরুতর আকার ধারণ করে তখন তিনটি পিণ্ড এক হ'য়ে যায়। একে বলা হয় গৌণ অর্শ বা সেকেণ্ডারী পাইল্‌স্ (Secondary Piles)। উর্ধ্ব-

হেমোরয়েড শিরার রক্তপ্রবাহে বাধা জন্মালে অর্শ রোগ হয় একথা স্পষ্ট বুঝতে পারা গেল। এখন জিজ্ঞাস্য হ'তে পারে, কোন্ কোন্ অবস্থায় রক্ত-চলাচলে বাধা সৃষ্টি হওয়া সম্ভব? গবেষণার পর চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য ঐ শিরাতে রক্তচলাচলে বাধা সৃষ্ট হতে পারে বলে সিদ্ধান্ত করেছেন।

(1) পুরোনো কোষ্ঠকাঠিন্য রোগ (Chronic Constipation) থাকলে আবদ্ধ কঠিন মল রেক্টামের দেয়ালে চাপ দেয়।

(2) কোষ্ঠকাঠিন্য ছাড়াও কোঁথ দিয়ে মলত্যাগ করার অভ্যাস।

(3) প্রায়ই লবণ জলের রেচক দিয়ে মলত্যাগ।

(4) প্রত্যহ দীর্ঘসময় দাঁড়িয়ে কাজ করার জন্য।

(5) অত্যধিক মদ্যপানের ফলে।

(6) অত্যধিক মেদ বৃদ্ধির ফলে যকৃৎ-এর পোর্ট্যাল-শিরায় রক্ত চলাচলে বাধা সৃষ্টির জন্য।

(7) পুরোনো ব্রঙ্কাইটিস রোগের দরুণ কাশীর সময় তলপেটে বারে বারে চাপ পড়ার ফলে।

(8) প্রষ্টেটট গ্রন্থির আয়তন বৃদ্ধি পেলে (পুরুষদের ক্ষেত্রে), কোলাইটিস (বৃহদন্ত্রের একটি অংশের রোগ) অথবা রেক্টামে কর্কট রোগ হলে।

(9) পেটে টিউমার হলে অথবা যকৃৎ-এর কোন রোগে পোর্ট্যাল-শিরাতে চাপ বৃদ্ধি পেলে।

(10) হৃদপিণ্ডের মাংসপেশী, অর্থাৎ মায়োকার্ডিয়াম-এর কোন রোগ থাকলে।

আঙ্গুল দিয়ে পরীক্ষা করলে অর্শের 'বলি' বেশ নরম বোধ হয়। মলত্যাগের সময় মলের চাপে প্রথমে শ্লেষ্মার মত চট্‌চটে পদার্থ বেরোয়; তারপরে সুরু হয় রক্ত পড়া। মলত্যাগের সময় কোষ্ঠ-কাঠিন্যের জন্যে তলপেটে স্বভাবতই বেশী চাপ দিতে হয়। ক্রমাগত

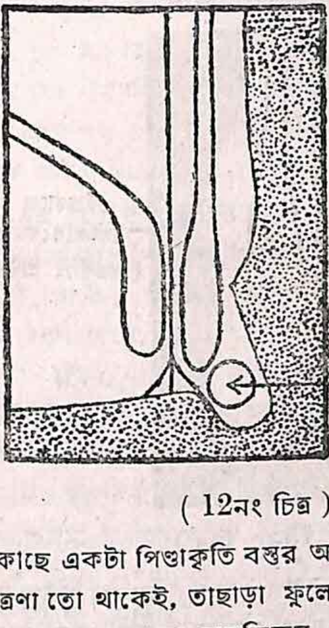
চাপের ফলে মিউকাস মেমব্রেন সমেত অর্শ নীচের দিকে ঠেলে আসে। এই সময় মল-নালীর স্ফিংক্টার এনাই মাংসপেশী ঐ পিণ্ডটিকে (অর্শ) আটকে রাখে। আমরা হাতের তালু দিয়ে যেমন ভাবে বল আঁকড়ে ধরি, উক্ত মাংসপেশীও অনেকটা সেইরূপ পিণ্ডটাকে আটকে রাখে। এর ফলে, ঐ পিণ্ডে রক্ত-সঞ্চালন প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়ে ধীরে ধীরে অবরুদ্ধ রক্ত জমাট বাঁধে। এই ধরণের অর্শের নাম 'রুদ্ধ অর্শ' বা ষ্ট্রাঙ্গুলেটেড পাইল্‌স্। (9নং চিত্র দ্রষ্টব্য)

রোগের প্রথম অবস্থায়, অন্তর্বলি আয়তনে বেড়ে গেলেও ভিতরেই থাকে, বাইরের দিকে ঠেলে বেরোয় না। তখন তাদের বলা হয় প্রথম স্তরের অর্শ। যে মিউকাস মেমব্রেন দিয়ে 'বলি' ঢাকা থাকে তা খুব পাতলা আর তা সহজেই ছিঁড়ে যায়। মলত্যাগের সময় এই পাত্‌লা ও ভঙ্গুর মিউকাস মেমব্রেন কুঁচকে গিয়ে ছিঁড়ে যায়। তার ফলে রক্তপাত হয়। প্রথম অবস্থায় মলদ্বার দিয়ে রক্তপাত হওয়াটাই রোগের একমাত্র উপসর্গ।

দীর্ঘ দিনের কোষ্ঠকাঠিন্যের ফলে মলত্যাগের সময় ক্রমাগত তলপেটে চাপ পড়ায় মল-নালীর মিউকাস মেমব্রেনের নীচেকার তন্তু স্থিতিস্থাপকতা হারিয়ে ফেলে। তার জন্য মলত্যাগের পর 'বলি' ভিতরের দিকে যায় না। মিউকোসাল লিগামেন্ট দুর্বল হ'তে থাকে, তাছাড়া মল-নালীর মাংসপেশীর মধ্যে কোন কারণে আপনা থেকেই খেঁচুনীর জন্যেও অন্তর্বলি ভিতরের দিকে না গিয়ে মলদ্বার দিয়ে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়। তবে যতদিন পর্যন্ত মিউকাস মেমব্রেনের নীচেকার তন্তু, বিশেষভাবে মিউকোসাল লিগামেন্ট, কর্মক্ষম থাকে ততদিন পর্যন্ত মলত্যাগের পর 'বলি' ভিতরের দিকে নিজে চলে যায়। এরা নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে 'বলি' ভিতরে যাবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। এটি হচ্ছে অন্তর্বলির দ্বিতীয় পর্যায়।

'বলি' ক্রমাগত বাইরের দিকে ঠেলে আসার জন্যে চাপ দিতে থাকায় মিউকোসাল লিগামেন্ট ধীরে ধীরে দুর্বল ও নিষ্ক্রিয় হয়ে

পড়ে। তখন মলত্যাগের পর 'বলি' নিজ থেকে ভিতরে যায় না এবং আঙ্গুল দিয়ে জোর ক'রে ভিতরের দিকে ঠেলে দেওয়া ছাড়া কোন উপায় থাকে না। মিউকোসাল লিগামেণ্ট অসাড় হলে মিউকাস মেমব্রেনও চামড়ার নীচের স্তর, উর্ধ্ব ও নিম্ন হেমোরয়েড শিরা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে যায়। রোগী এই সময় সর্বদাই



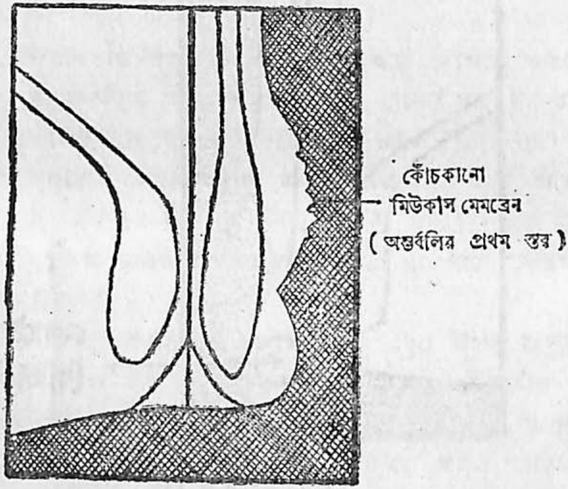
(12নং চিত্র)

মলদ্বারের কাছে একটা পিণ্ডাকৃতি বস্তুর অবস্থিতি অনুভব করে। বিশ্রী রকমের যন্ত্রণা তো থাকেই, তাছাড়া ফুলে-ওঠা জায়গা থেকে শ্লেষ্মা নির্গত হতে থাকায় আরো অস্বস্তিকর অবস্থায় সৃষ্টি হয়। এটি হ'লো রোগের তৃতীয় পর্যায়। এই বলিকে অনেকে ইণ্টারো-এক্সটারন্যাল পাইল্স্ বলে থাকেন।

প্রতিদিন রক্ত ক্ষরণের ফলে রোগী রক্তহীন হয়ে পড়ে। মলদ্বারের কাছে সব সময় যন্ত্রণাবোধ হয় ও শ্লেষ্মা বেরোয়। একটানা চারদিনও যন্ত্রণা চলতে পারে। তাছাড়া মনে হয় যন্ত্রণার উৎসটি কাঁপছে।

যখন 'বলি'র মধ্যে রক্ত জমাট বাঁধে তখনই এ ধরণের অনুভূতি হয়। মলদ্বার দিয়ে গাঢ় রক্তবর্ণের একটি, দু'টি বা তিনটি পিণ্ড বেরিয়ে আসে।

বহির্বলির উপসর্গও মোটামুটি একই ধরণের। তবে এক্ষেত্রে মলদ্বারের চামড়ার নীচে একটু শক্ত পিণ্ড অনুভব করা যায়। এই পিণ্ডকে আবার হাত দিয়ে এদিক-ওদিক সরানো যেতে পারে। 'বলি'র



(13নং চিত্র)

মধ্যে রক্ত জমাট বাঁধলেই এ রকম হয়। তাছাড়া হঠাৎ মলনালীতে-যন্ত্রণাবোধ হতে থাকে এবং মলত্যাগ বন্ধ হয়ে যায়। একে হেমাটোমা বলা হ'য়ে থাকে।

স্ট্র্যাংগুলেটেড পাইল্‌স্ বা রুদ্ধ-অর্শ রোগে মলদ্বারে কালো, ক্ষতবিক্ষত দুর্গন্ধযুক্ত বড় বড় পিণ্ড অনুভব করা যায় এবং খুব যন্ত্রণা হয়।

এতক্ষণ নানাধরণের অর্শরোগ, তার 'বলি' ও উপসর্গ সম্বন্ধে আলোচনা করা হ'লো। এবার চিকিৎসা সম্পর্কে কিছু বলা যাক।

ত্রিবিধ উপায়ে এর চিকিৎসা করা চলে। রোগের অবস্থা অনুসারে চিকিৎসার বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

(1) যন্ত্রণা নিরোধক ব্যবস্থা—অর্শের প্রথম অবস্থায় অথবা স্ট্র্যাংগুলেটেড অর্শরোগে এই চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। প্রাথমিক অর্শরোগে লবণ জলের রেচক ব্যবহার নিষিদ্ধ ক'রে নিয়মিত মল নির্গমণের জন্যে রোগীকে লিকুইড প্যারাফিন দিতে হয়। তাছাড়া রোগীকে হাল্কা খাবার এবং বেশী করে তরল পদার্থ (দুধ, ডাবের জল, বার্লির জল ইত্যাদি) এবং ফলের রস দেওয়া দরকার। অ্যাড্রি-ন্যালিন, হ্যামামেলিম এবং জলপাই-এর তেল দিয়ে ক্রীম তৈরী করে, আঙ্গুল দিয়ে অথবা যন্ত্রের সাহায্যে ঐ ক্রীম রাত্রে এবং মলত্যাগের আগে রেক্টামের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হয়।

আস্তে আস্তে চাপ দিয়ে স্ট্র্যাংগুলেটেড অর্শের 'বলি' ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া যেতে পারে। তাতে সফল না হলে মলদ্বারের চারপাশে ওষুধ দিয়ে অবশ ক'রে, যন্ত্রের সাহায্যে মল-নালীর স্ফিংক্টার মাংস-পেশীকে একটু টেনে, বলিটিকে ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে।

(2) ইনজেক্‌শন প্রয়োগ—অন্তর্বলির প্রথম এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে রোগ যখন সম্পূর্ণ জটিল হ'য়ে পড়েনি, তখন এই চিকিৎসার ফলে রোগ উপশমের সম্ভাবনা থাকে। অন্তর্বলির প্রথম পর্যায়ে অর্থাৎ যখন রক্তক্ষরণ একমাত্র উপসর্গ, তখন ইনজেক্‌শন প্রয়োগে সুফল পাওয়া যায়। তবে তৃতীয় পর্যায়ে যে উপকার পাওয়া যায় না তা নয়, কিন্তু সে ক্ষেত্রে আরোগ্য ক্ষণস্থায়ী হয়। কয়েক রকমের তরল ওষুধ, বিশেষ ধরণের সিরিঞ্জের সাহায্যে মল-নালীর মিউকাস মেমব্রেনের নীচে ইঞ্জেকশন করা হয়।

মাত্রাতিরিক্ত ওষুধ ইঞ্জেকশন করা হলে রোগীর মাথাঘোরা, অস্বস্তিবোধ ইত্যাদি উপসর্গ আসতে পারে। তবে সেটা অবশ্য সাময়িক। যদি শিরার মধ্যে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়, তাহলে রোগীর উপর-পেটে ব্যথা হয়, যকৃৎ বাড়ে এবং পান্ডুরোগও দেখা দিতে পারে।

(3) অস্ত্র-চিকিৎসা—অর্শরোগ জটিল হ'য়ে পড়লে অস্ত্রোপচার ছাড়া কোন উপায় থাকে না। অস্ত্রোপচারের পরে প্রথম কয়েক দিন বেশ যন্ত্রণা হ'তে পারে। বয়স্ক লোকদের ঐ সময়ে সাময়িকভাবে প্রস্রাব বন্ধ হ'য়ে যেতে পারে।

অর্শরোগ যে অতি নোংরা এবং যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। রোগীর অজ্ঞাতসারে রক্তপড়া সুরু হয়ে কাপড়-চোপড় নষ্ট করে দেয় ও মানসিক অস্বস্তির সৃষ্টি করে। মল ত্যাগের সময় গুরুতর অসুবিধার সৃষ্টি হয়। রোগী যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করতে থাকে। তাই মলত্যাগের কথা ভাবতেই অর্শ রোগী কেঁপে ওঠে।

কাজেই কোষ্ঠকাঠিন্য থাকলে এবং লোকের মলত্যাগের সময় রক্ত পড়লে তখনই সতর্ক হওয়া উচিত। প্রত্যেক দিন সকালে একটি করে কাঁচা বেল পুড়িয়ে খেলে পেট পরিষ্কার হয়। মাঝে মাঝে, অন্তত সপ্তাহে একদিন ত্রিফলা-সিদ্ধ (হরিতকি. আমলকি, বহেড়া) খেয়ে পেটের মল পরিষ্কার করে ফেলা উচিত। আর রোগের লক্ষণ কিছু প্রকাশ পেলে সঙ্গে সঙ্গেই উপযুক্ত চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা উচিত।

বঙ্গীয়
বিজ্ঞান
পরিষদ